মুমিনের আখলাক

ড. ইয়াসির ক্বাদি

ভাষান্তর | আরিফুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

ড. ইয়াসির ক্বাদি।

জন্ম আমেরিকায় ১৯৭৫ সালে। হুস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর বিএসসি করেছেন। ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে যান উচ্চতর অধ্যয়ন করতে। প্রথমে হাদিস ও ইসলামি শাস্ত্র অনুষদ থেকে আরবি ভাষার ওপর ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে দাওয়াহ অনুষদ থেকে ইসলামি ধর্মতত্ত্বের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। আমেরিকায় ফিরে এসে ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে ধর্মতত্ত্বে পিএইচডি করেন।

২০০১ সাল থেকে তিনি আল মাগরিব ইনস্টিটিউট-এর অ্যাকাডেমিক বিভাগের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া অধ্যাপনা করছেন টেনিসির রোডস কলেজের ধর্মশিক্ষা বিভাগে। সোশ্যাল মিডিয়াতে অব্যাহতভাবে কথা বলছেন সমসাময়িক ইস্যু ও ইসলামের মৌলিক নীতিমালা নিয়ে।

২০১১ সালে *দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস* -এর এক নিবন্ধে ড. ইয়াসির ক্বাদিকে আমেরিকায় ইসলামের সবচেয়ে প্রভাবশালী পণ্ডিতদের একজন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় এবং নানান ভাষায় অনূদিত হচ্ছে।

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স থেকে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো–*দুআ বিশ্বাসীদের হাতিয়ার, বিশ্বাসীদের মা, জ্ঞান ও পবিত্রতায় ভাস্বর আয়িশা (রা.), কুরআনিক দুআ, দাম্পত্য রসায়ন, ঈমান বৃক্ষ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আশারায়ে মুবাশশারা*

মুমিনের আখলাক

মুমিনের আখলাক

মূল : ড. ইয়াসির ক্বাদি

ভাষান্তর : আরিফুল ইসলাম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০২-৫৭১৬৩২১৪, ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
info@guardianpubs.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ	০৫ নভেম্বর, ২০২৪
অনুবাদস্বত্ব	গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
প্রচ্ছদ	কাজী যুবাইর মাহমুদ
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৫৫৮২-৯-৩
ফিক্সড প্রাইস	১৮০ টাকা

প্রকাশকের কথা

বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতার অনেক অনেক শক্তিশালী উপাদান থাকলেও একটি শক্তি তাদের কখনোই ছিল না। সেটি হলো চারিত্রিক শক্তি। বিপরীতে ইসলামি সভ্যতার মৌলিক উপাদানই হলো উত্তম চরিত্র। ফলে ইসলামের আগমনের সাথে সাথে অন্য সকল সভ্যতা ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ইসলাম আলো ছড়ায় পুরো পৃথিবীজুড়ে।

সময়ের স্রোতধারায় যখন ইসলামি সভ্যতার ধারক মুসলিমরা এই চারিত্রিক শক্তি ক্ষয়ে ফেলল, চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল পরাজয়।

নবুয়ত লাভের পূর্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সচ্চরিত্রের আধার। গণমানুষ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন আল আমিন, আস-সাদিক হিসেবে। ওহিপ্রাপ্তির পর বিরুদ্ধবাদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করলেও তাঁর চরিত্র নিয়ে পরোক্ষভাবেও কেউ আঙুল তুলতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই 'খুলুকুন আজিম'-এর পরশ দিয়ে এমন একদল জনশক্তি তৈরি করেছিলেন, যারা চারিত্রিক শক্তিতে ছিলেন উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। পৃথিবীর যে প্রান্তেই তারা কদম রেখেছেন, মানুষ তাঁদের নিকট ছুটে এসেছে পঙ্গপালের ন্যায়।

সাহাবায়ে আজমাই যখন কোনো প্রেক্ষাপটে কারও দোষ বর্ণনা করতেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তির নাম গোপন রেখে ঘটনা উল্লেখ করতেন। তাঁরা ফোকাস করতেন দোষ এবং সেটার সংশোধন পদ্ধতির দিকে; ব্যক্তিকে আক্রমণ বা ব্যক্তির মুখোশ উন্মোচন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না।

কিন্তু বর্তমান যুগে যুবকরা এক গুরুতর সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আলিমগণ এটিকে আখলাকি সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন। আমরা কারও সমালোচনা করার ক্ষেত্রে তার আত্মমর্যাদার দিকে খেয়াল রাখছি না। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা যেন খেই হারিয়ে ফেলছি। ফলে তিক্ততা বাড়ছে প্রতিনিয়ত, যা কখনো কখনো সীমাও অতিক্রম করছে।

এই বিষয়গুলোকেই সামনে এনেছেন সময়ের আলোচিত স্কলার ড. ইয়াসির ক্বাদি। তিনি কুরআন, হাদিস ও সিরাতের আলোকে মুমিনের আখলাকি বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। আশা করছি, বইটি থেকে পাঠকবৃন্দ অতীব প্রয়োজনীয় উপজীব্য পাবেন।।

বইটি অনুবাদ করেছেন লেখক, অনুবাদক আরিফুল ইসলাম ভাই। আল্লাহ তার এই কাজকে কবুল করুন, তার কাজে বারাকাহ দান করুন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।

অনুবাদকের কথা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের ইসলাম গ্রহণের বিভিন্ন ঘটনা পাওয়া যায়। দেখা যায় অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন কোনো এক মুসলিমের আখলাক দেখে।

অফিসের সবাই যতক্ষণ না কাজ করে, তার চেয়ে বেশি সময়ের হিসাব দেয়। কিন্তু একজন কম সময়ের হিসাব দেয়।

নিরীক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি এমনটা করেন?

তিনি জানান, মুসলিম হিসেবে মিথ্যা বলে যে উপার্জন করবেন, সেটা তার জন্য হারাম। তিনি হারাম টাকায় জীবনযাপন করতে চান না।

এই কথা শুনে সেই নিরীক্ষক ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুসলিমদের আমানতদারিতা দেখেও অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ রকম উদাহরণও অনেক।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন ব্যবসায়ীরা। আরব ব্যবসায়ীদের দেখে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা মূলত মুমিনের আখলাক দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেই মুমিনের আখলাক দেখে অন্যরা একসময় ইসলাম গ্রহণ করত, সেই মুমিনের অবস্থা এখন কেমন?

যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরাইশের অমুসলিমরা আমানত জমা রাখত, এখনকার সমাজে মুসলিমরা মুসলিমদের কাছে (আত্মীয়, বন্ধু না) কি এতটা বিশ্বস্ত?

আমাদের এই আখলাকি সংকট কতটা প্রকট, সেটা প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাই।

সেই সংকট কীভাবে দূর করা যায়, এই নিয়ে ড. ইয়াসির ক্বাদি রমজান মাসে একটি সিরিজ আলোচনা করেছেন।

বক্ষমাণ বইটি সেই আলোচনার ভাবানুবাদ।

আশা করি, এই বইটি আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার হবে এবং আমাদের নিজেদের বদলে ফেলার বার্তা দেবে।

স্বনামধন্য প্রকাশনী গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স বইটি প্রকাশ করায় আমি গর্বিত।

আমাদের এই প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন।

আরিফুল ইসলাম
৩ নভেম্বর, ২০২৪
দনিয়া, ঢাকা।

সূচিপত্র

চরিত্র কি আল্লাহ্ প্রদত্ত নাকি অর্জিত ॥ ১৩
নম্রতা ॥ ১৮
সামনে আসার ইচ্ছে প্রকাশ না করা ॥ ১৯
আপনার প্রশংসা করা হলে আপনি অস্বস্তিভোগ করবেন ॥ ১৯
ভুল হলে সংশোধনের মানসিকতা রাখা ॥ ১৯
অহংকারের পরিণতি নিয়ে ভাবা ॥ ২১
অন্তরকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ॥ ২১
গোপন আমল ॥ ২১
কোনো হালাল কাজকে অবজ্ঞা না করা ॥ ২২
গরিব, দুর্বলদের সঙ্গে সময় কাটানো ॥ ২২

সত্যবাদিতা ॥ ২৩
দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলা ॥ ২৪
আল্লাহর নামে কসম করে মিথ্যা বলা ॥ ২৫
ব্যাবসার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ॥ ২৫

ধীরস্থিরতা ॥ ২৮

প্রজ্ঞা ॥ ৩৫
দ্বীনের ব্যাপারে হিকমা ॥ ৩৬
মানবজাতির সাথে হিকমার সহিত আচরণ ॥ ৩৭
হিকমা অবলম্বন করে ব্যাবসা ॥ ৩৭
পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ॥ ৩৮
ইতিহাস পাঠ ॥ ৩৯

রাগ নিয়ন্ত্রণ ॥ ৪০
দুআ করা ॥ ৪৩
অজু করা ॥ ৪৪

কাজ কমিয়ে দেওয়া ॥ ৪৪
নীরবতা অবলম্বন ॥ ৪৪
আমানতদারিতা ॥ ৪৬
দ্বীনের আমানত ॥ ৪৭
দায়িত্বের আমানত ॥ ৪৮
আর্থিক আমানত ॥ ৪৮
জিহ্বার আমানত ॥ ৪৮
কথার আমানত ॥ ৪৮
পরামর্শের ক্ষেত্রে আমানত ॥ ৪৯
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আমানত ॥ ৫০
ভালো কাজে অন্যকে সহযোগিতা ॥ ৫১
অন্যের দোষ গোপন রাখা ॥ ৫৪
পাপীর তাওবা করা কঠিন হয় ॥ ৫৬
নিজের অহংকার বাড়ে ॥ ৫৭
পাপের কথা প্রচার হলে সেটা স্বাভাবিক হয় ॥ ৫৭
ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি তৈরি ॥ ৫৭
হাসিমুখে কথা বলা ॥ ৫৮
আশাবাদী হওয়া ॥ ৬২
ইসলামে কেন ইতিবাচক ধারণা গ্রহণযোগ্য ॥ ৬৩
অন্যের ব্যাপারে সুধারণা ॥ ৬৭
কে আপনাকে নিয়ে কী বলল সেটা ভুলে যান ॥ ৬৮
ভালো ধারণার চেষ্টা করা ॥ ৬৯
যাচাই করে নেওয়া ॥ ৭০
ইসলাম নিয়ে গর্ববোধ করা ॥ ৭৩
লজ্জা : ঈমানের অঙ্গ ॥ ৭৭
দয়া ও কোমলতা ॥ ৮২
কৃতজ্ঞতাবোধ ॥ ৯১

অন্তরের কৃতজ্ঞতা ॥ ৯৩
জবানের কৃতজ্ঞতা ॥ ৯৩
আমলের কৃতজ্ঞতা ॥ ৯৪
জবানের হেফাজত ॥ ৯৮
অন্যের সম্মান রক্ষা ॥ ১০৩
উচ্চাকাঙ্ক্ষা ॥ ১১০
অন্যকে সালাম দেওয়া ॥ ১১৫
সহজতা অবলম্বন ॥ ১১৯
ন্যায়বিচার ॥ ১২৪
ন্যায়বিচারের একটি স্বর্ণালি ঘটনা ॥ ১২৯
সম্পর্ক জোড়া লাগানো ॥ ১৩০
ক্ষমাশীলতা ॥ ১৩৫
মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ ॥ ১৪১
দানশীলতা ॥ ১৪৫
অন্যের সাথে পরামর্শ করা ॥ ১৫০
অন্যকে ভালোবাসা ॥ ১৫৫

চরিত্র কি আল্লাহ্ প্রদত্ত নাকি অর্জিত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি নৈতিকতাকে পূর্ণতা দান করার জন্য নবি হয়ে এসেছি।[১]

আল্লাহ তায়ালা নবি পাঠিয়েছেন আমাদের আখলাক শেখানোর জন্য। মানুষের সাথে আমরা কেমন আচরণ করব, তা শেখানোই ছিল নবি-রাসূল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

'আখলাক' শব্দটি 'খুলুক' শব্দের বহুবচন। তবে খুলুক ও খালাকা একই শব্দমূল হতে এসেছে, যার অর্থ—সৃষ্টি করা। খালক আর খুলক-এর শব্দমূলও এক। একটির অর্থ—সৃষ্টি করা, আরেকটির অর্থ—চরিত্র। খালক হলো আপনার শরীরের বাইরের অংশ, খুলক হলো আপনার শরীরের ভেতরের অংশ। আপনার হাত, পা, চোখ, নাক এগুলো হলো খালক। আর আপনার আচার-ব্যবহার, কথা বলার ধরন, চারিত্রিক গুণাবলি হলো খুলক।

আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ আখলাককে তিনভাবে ভাগ করেছেন। যেমন :

১. **আল্লাহর প্রতি আপনার আখলাক :** আল্লাহর প্রতি ঈমান, ইখলাস, ভালোবাসা, সুধারণা রাখা হলো এই ধরনের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

২. **মানুষের প্রতি আপনার আখলাক :** মানুষের সাথে কেমন আচরণ করবেন, অর্থাৎ ধৈর্যধারণ, ক্ষমাশীলতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হলো এই ধরনের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **নিজের সাথে আখলাক :** আপনি নিজের সাথে কতটুকু সুবিচার এবং কেমন ব্যবহার করবেন, এটা তৃতীয় প্রকার আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : যখন কোনো কিছু করবেন বলে ভাবছেন কিংবা করছেন, সেটাতে মনোযোগ দেবেন এবং ভালোভাবে করবেন।

আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো, দ্বিতীয় প্রকার আখলাক। একজন ভালো মুসলিম হতে হলে কী কী করতে হবে, আখলাকসংক্রান্ত আলোচনা থেকে

---

[১] *মুয়াত্তা ইমাম মালেক* : ১৬১৯

তা আমরা শিখব। মনে রাখবেন, ভালো মুসলিম হওয়া মানেই বেশি বেশি ইবাদত করা না: মুয়ামালাতও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আপনাকে ভালো মুসলিম হতে হলে যেমন বেশি বেশি ইবাদত করতে হবে, তেমনই উত্তম চরিত্রের অধিকারীও হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—এমনও হতে পারে, একজন চরিত্রবান বান্দাকে আল্লাহ এমন আসনে আসীন করতে পারেন, যে আসনে সেই বান্দা আছে, যে কিনা নিয়মিত নামাজ পড়ে এবং রোজা রাখে।[২]

একজন নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, নফল রোজা রাখে, কিন্তু আরেকজন সেগুলোর কোনো কিছুই করে না। যে নিয়মিত নফল নামাজ পড়ে না, নফল রোজা রাখে না। দেখা গেল, সে উত্তম আখলাকের অধিকারী। কিয়ামতের দিন তার এই উত্তম আখলাকের কারণে আল্লাহ তাকে নিয়মিত ইবাদতকারীর সমান আসনে বা তারও ওপরের আসনে রাখবেন। নবিজি বলেন, কিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে ওজনে বেশি আর কোনো জিনিস হবে না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।[৩]

আখলাককে কোনোভাবেই ছোটো করে দেখার সুযোগ নেই। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন—যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি ঘরের জিম্মাদার।[৪]

আমরা বুঝলাম সচ্চরিত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। তবে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়—সচ্চরিত্র গুণ কি আল্লাহ প্রদত্ত নাকি এটা অর্জন করতে হয়? আমরা কি আমাদের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নাকি এটা নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে?

সন্তানের জনক বা জননীরা জানেন, একেক সন্তানের স্বভাব-চরিত্র একেক রকম। কোনো সন্তান খুব ধৈর্যশীল। কোনো সন্তান অল্পতেই রেগে যায়। কোনো সন্তান অধিক চাপ নিতে পারে। আবার কোনো সন্তান তা একদমই নিতে পারে না। মানুষের মাঝে এমন বৈচিত্র্য প্রায়ই চোখে পড়ে। ঠিক একই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলে গেছেন।

আশাজ্জ ইবনে কায়েস নামের এক গোত্রপতি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবিজি তাঁকে বললেন, হে আশাজ্জ! তোমার দুটি বিশেষ গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত পছন্দ করেন। সেগুলো হলো, ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতা। আশাজ্জ ইবনে কায়েস

---

[২] *মাজমু আল আওসাত* : ৩৯৮২, শাইখ আলবানির মতে হাদিসটি সহিহ।

[৩] *জামে আত-তিরমিজি* : ২০০২

[৪] *সুনানে আবু দাউদ* : ৪৮০০

(রা.) নিজের প্রশংসা শুনে রাসূলুল্লাহকে খুব বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই কি এই গুণ দুটি অর্জন করেছি নাকি আল্লাহ আমাকে এই গুণের ওপর সৃষ্টি করেছেন? রাসূলুল্লাহ উত্তর দিলেন, আল্লাহ তোমাকে এই দুটি গুণের ওপরই সৃষ্টি করেছেন।

এ কথা শুনে আশাজ্জ ইবনে কায়েস (রা.) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সেই মহান রবের, যিনি আমাকে এমন দুটি স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছেন, যাকে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।[৫] আরেকটি হাদিসে নবিজি বলেন, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে চরিত্র বণ্টন করেছেন, যেভাবে তিনি তোমাদের মধ্যে রিজিক বণ্টন করেছেন।[৬]

কেউ কেউ ধনী হয়ে জন্মায়, কেউ কেউ গরিব। কেউ রাজা-বাদশার ঘরে জন্মায়, কেউবা বস্তিতে। কেউ খুব সহজেই অর্থোপার্জন করতে পারে, কেউ মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও তেমনটা পারে না। একই কথা খাটে চরিত্রের বেলায়ও। কিছু চারিত্রিক উপাদান আছে, যা জন্মগত আর কিছু উপাদান আছে, নিজেকে অর্জন করে নিতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জেনে রাখো! মানুষের মধ্যে কারও রাগ আসে দেরিতে এবং যায় খুব তাড়াতাড়ি। আবার কারও রাগ আসে তাড়াতাড়ি, যায়ও তাড়াতাড়ি। কারও রাগ আসে তাড়াতাড়ি, যায় দেরিতে। তবে তাদের মধ্যে উত্তম হলো—যাদের রাগ আসে দেরিতে কিন্তু চলে যায় তাড়াতাড়ি। আর তারাই খুব নিকৃষ্ট, যাদের রাগ আসে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু যায় দেরিতে।[৭]

এখন কেউ কেউ বলতে পারেন, আল্লাহ যেহেতু আমাকে ধৈর্য ধরার ক্ষমতা কম দিয়েছেন, অধৈর্য হয়ে গেলে তাতে আমার দোষ কী? আল্লাহ আমাকে ক্ষমাশীলতার গুণ দেননি, এতে আমার কী দোষ?

এর জবাব হলো, এটা ঠিক যে আল্লাহ আপনাকে ধৈর্যশীল বানাননি; কিন্তু এর মানে এই না যে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন না। চরিত্রের কিছু উপাদান আছে জন্মগত। আর কিছু উপাদান নিজ থেকে অর্জন করে নিতে হবে। চরিত্রের কিছু উপাদান আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা চাইলে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কীভাবে আমাদের চরিত্র বদলাতে পারি? কীভাবে আমরা সচ্চরিত্রবান হতে পারি? সমাধান নিশ্চয়ই আছে; আমরা চারটি বিষয়ের আলোকে কথা বলব, ইনশাআল্লাহ!

---

[৫] সহিহ মুসলিম : ২৫; সুনানে আবু দাউদ : ৫২২৫

[৬] ইমাম বুখারি, *আদাবুল মুফরাদ* : ২৭৫

[৭] জামে আত-তিরমিজি : ২১৯১

১. সবকিছু জ্ঞানানুযায়ী করব : আমাদের জানতে হবে আখলাক কাকে বলে। উত্তম আখলাকের অধিকারী হওয়ার ফজিলত কী? কীভাবে উত্তম আখলাক অর্জন করতে হয়? কুরআন ও সুন্নাহ উত্তম আখলাকের ব্যাপারে কী বলে? পবিত্র কুরআন খুললে দেখতে পাই, লুকমান (আ.) তাঁর ছেলেকে আখলাক শিখিয়েছিলেন। যদিও জন্মগতভাবে তাঁর ছেলে আল্লাহ প্রদত্ত কিছু গুণাবলি অর্জন করেছিল, তারপরও বাবা হিসেবে তিনি ছেলেকে আখলাক শিখিয়েছেন।

২. একজন রোলমডেল দরকার : উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হলে আপনাকে উত্তম চরিত্রের এমন কাউকে অনুসরণ করতে হবে। আর তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন—

'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।'[৮]

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আরও বলেন—

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত পড়ে আমরা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারি। তা ছাড়া আমাদের আশেপাশে যারা রাসূলুল্লাহর আদর্শমতো জীবনযাপন করেন, তাদেরও অনুসরণ করতে পারি।

৩. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে : বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় আমরা থিওরি পড়ি। চাকরি করার সময় সেই থিওরি প্রয়োগ করি। এতে আমাদের থিওরিটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল দুই ধরনের জ্ঞান আহরণ হয়। এরই মাঝখানে আমরা ভুল করি এবং তা থেকে শিক্ষা নিই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জিত হয়। আর সহনশীলতা অনুশীলন করার মাধ্যমে অর্জিত হয় সহনশীলতা।[১০]

আপনি রসায়নের বই বিছানার পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়লে রসায়ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারবেন না। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হলে অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে। একই কথা যেকোনো গুণের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। আপনি যদি কোনো গুণ অর্জনের চেষ্টা-সাধনা না করেন, তবে কখনোই তা অর্জন করতে পারবেন না। তেমনই সহনশীলতার গুণ অর্জন করতে হলে আপনাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। এমন একটি অবস্থার মুখোমুখি হলেন, যখন আপনাকে ধৈর্য

---

[৮] সূরা কালাম : ৪

[৯] সূরা আহজাব : ২১

[১০] *তারিখে বাগদাদ* : ৯/১২৯; শাইখ আলবানির মতে হাদিসটি গ্রহণযোগ্য।

ধরতে হবে, মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। তখন সেই অবস্থায় ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবেন। মুখস্থ বই পড়ে আসলে ধৈর্যধারণ করা যায় না। এটা প্রায়োগিক বিষয়। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সেটার অনুশীলন করতে হবে।

৪. আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করা : সবকিছুর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে; এমনকি সচ্চরিত্রবান হওয়ার জন্যও। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যতই সচ্চরিত্রবান হিসেবে সৃষ্টি করুন, আপনি যতই সচ্চরিত্রের গুণ অর্জন করুন না কেন, তারপরও আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনিও পর্যন্ত আল্লাহর কাছে সচ্চরিত্রের জন্য দুআ করতেন—

> 'হে আল্লাহ! আমাকে সর্বোত্তম আখলাক বা নৈতিকতার পথ দেখান। আপনি ছাড়া আর কেউ এই পথ দেখাতে সক্ষম নয়। আর আখলাক বা নৈতিকতার মন্দ দিকগুলো আমার থেকে দূরে রাখুন। আপনি ছাড়া অন্য কেউ মন্দগুলোকে দূরে রাখতে সক্ষম নন।'[১১]

সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী হয়েও নবিজি বিনয়াবনত কণ্ঠে আল্লাহর কাছে দুআ করছেন—আল্লাহ যেন তাঁকে উত্তম আখলাকের অধিকারী করেন, মন্দ আখলাক থেকে দূরে রাখেন। সেখানে আমাদেরও যে দুআ করতে হবে এটা বলা বাহুল্য। আল্লাহর কাছে আমরাও উত্তম আখলাকের জন্য দুআ করব।

মনে করুন, আল্লাহ একজনকে ধৈর্যশীলতার গুণ দান করলেন, আর সেটা আরেকজনকে দান করেননি। কিন্তু যাকে দান করেননি, সে প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই গুণ অর্জন করল। বাহ্যিকভাবে দুজনই ধৈর্যশীল। কিন্তু যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধৈর্যশীলতার গুণ অর্জন করছে, সে কোনো ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরলে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে, যাকে আল্লাহ ধৈর্যশীলতার ওপর সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং আপনার যদি কোনো উত্তম গুণাবলি না থাকে, আপনি আপনার মতো চেষ্টা করে যান সেই গুণাবলি অর্জন করতে। যখন আপনি তা অর্জন করবেন, তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবেন, যার সৃষ্টিগতভাবে সেই গুণ ছিল।

---

[১১] সহিহ মুসলিম : ১৬৯৭

নম্রতা

মুমিনের আখলাকের অন্যতম উপাদান হলো নম্রতা। কেউ কেউ বলেন এটা হলো 'আখলাকের রানি'। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

'রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।'[১২]

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর ইবাদত করা এবং বিনয়, নম্রতাকে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। আলিমগণ বলেন, ঈমানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো নম্রতা। আপনার যদি ঈমান থাকে, আপনি বিনয়ী হবেন, কখনো অহংকারী হবেন না।

এখন আমরা জানার চেষ্টা করব, নম্রতা কাকে বলে? নম্রতার বৈশিষ্ট্য কী, কীভাবে নম্রতা অর্জন করতে হয়?

নম্রতার আরবি 'তাওয়াদু'। ওয়াদওয়াহ মানে নিজেকে ছোটো হিসেবে উপস্থাপন করা, নিচে নেমে পড়া। আপনি যখন নিজের ইগোকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোটো হিসেবে উপস্থাপন করবেন, তখন এই গুণ অর্জন করতে পারবেন। আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে এই গুণ অর্জন করতে বলেন—

'আপনি মুমিনদের জন্য আপনার বাহু অবনত করুন।'[১৩]

আল্লাহ রূপক অর্থে নবিজিকে মুমিনদের জন্য নম্র হতে বলেন। বাহু নত করা নম্র হওয়ারই নামান্তর। আমাদেরও সেই গুণ অর্জন করতে হবে, সেটা এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিলেন। তিনি নবিজির উম্মাহকে সরাসরি আরও জানিয়ে দিতে বলেন—তোমরা বিনয়ী হও, যতক্ষণ না একে অপরের ওপর জুলুম ও অহংকার করে।[১৪]

কে বিনয়ী এবং কে বিনয়ী না, চেনার কিছু উপায় আছে। আলিমগণ এমন কিছু লক্ষণের কথা আমাদের উল্লেখ করেছেন—

---

[১২] সূরা ফুরকান : ৬৩

[১৩] সূরা হিজর : ৮৮

[১৪] সহিহ মুসলিম : ২৮৬৫; সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৯৫

সামনে আসার ইচ্ছে প্রকাশ না করা

আপনি অনেকের মাঝে থাকাবস্থায় যদি মনে করেন সবাই আপনাকে নিয়ে কথা বলুক, আপনাকে কেন্দ্র করে তাদের আলোচনা চলুক, বুঝতে হবে আপনার মধ্যে বিনয়ের গুণটি নেই। যদি আশা করেন, আপনাকে সবাই মান্য করুক, গুরুত্ব দিক; গুরুত্ব না দেওয়াতে আপনার অস্বাভাবিক রাগ হচ্ছে, বুঝতে হবে এখানেও আপনার এই বিনয় গুণটি অনুপস্থিত। এজন্য নবিজি বলেন—যারা নেতৃত্ব চায়, আমরা তাদের নেতা বানাই না। সুতরাং নবিজির এই কথাটিই ইসলামের রুল অব থাম্ব।

আপনার প্রশংসা করা হলে আপনি অস্বস্তিভোগ করবেন

যদি আশা করেন মানুষ আপনার প্রশংসা করবে, প্রশংসা না করলে রাগ করেন, বুঝতে হবে আপনার মধ্যে নম্রতা নেই। হ্যাঁ, বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোনো গুণের জন্য মানুষ আপনাকে প্রশংসা করতে পারে। তখন আপনি আল্লাহর প্রশংসা করে সেটার কৃতিত্ব আল্লাহকে দেবেন। কিন্তু মনে মনে ভাবতে হবে, আপনি এমন প্রশংসা লাভের যোগ্য নন।

ভুল হলে সংশোধনের মানসিকতা রাখা

আপনি বিনয়ী নাকি অহংকারী সেটা বুঝতে পারবেন কেউ যখন আপনার ভুল ধরিয়ে দেবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে ভুল হলে তাওবা করবেন। মানুষের সাথে কোনো ভুল করলে তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। যদি এমন হয়, আপনি একটি ভুল করেছেন। আর তা একজন ধরিয়ে বা মনে করিয়ে দিলো, কিন্তু প্রচণ্ড রাগ হলো আপনার। তখন কিন্তু আপনার মনে অহমিকা ভাব চলে এসেছে। তা ছাড়া আপনি জানেন, ভুল আপনারই ছিল; কিন্তু আপনি ভুল স্বীকার করলেন না, নত হলেন না। বুঝতে হবে আপনার মধ্যে অহংকার জন্ম নিয়েছে। নবিজি অহংকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।[১৫] অহংকার করে সত্য অস্বীকার করা হলো শয়তানের কাজ। শয়তানের এই কাজকে আল্লাহ 'কুফর' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন—

> 'সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। অতঃপর সে হলো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।'[১৬]

আল্লাহর কাছে বিনয়ের বিপরীত হলো কুফর! আল্লাহকে স্বীকার করা কিংবা অহংকারবশত অস্বীকার করা।

---

[১৫] সহিহ মুসলিম : ১৬৬

[১৬] সূরা বাকারা : ৩৪

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিনয়ের মূর্তপ্রতীক। পুরো সিরাত পড়লে দেখতে পাই, তিনি আমাদের জন্য বিনয়ের শত শত উদাহরণ রেখে গেছেন। নবিজি এমনভাবে জীবনযাপন করতেন, বাইরে থেকে কেউ এলে জিজ্ঞেস করত, তোমাদের মধ্যে নবি কে?

নবিজি চাইতেন না, মানুষজন তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াক। আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, সাহাবিদের কাছে নবিজির চাইতে প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। অথচ তারা তাঁকে দেখে দাঁড়াতেন না। কেননা, তারা জানতেন, তিনি এটা পছন্দ করেন না।[১৭]

নবিজি খুব সাধারণ পোশাক পরতেন। ঘরের কাজ করতেন। নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন। গাধা-খচ্চরের ওপর আরোহণ করতেন। কেউ কেউ তাঁকে 'আবুল কাসিম' বলে ডাকত। তিনি তাতে কিছু মনে করতেন না।

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন, উদ্‌বেগ হতে পারে—বিনয়ী হলে লাভ কী হবে? এর জবাবও নবিজি দিয়েছেন। তিনি সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেন—আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না, কোন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম এবং জাহান্নামের কোন ব্যক্তির জন্য হারাম? সাহাবিরা জানতে চাইলে তিনি বলেন—যে ব্যক্তি মানুষের কাছাকাছি, সহজ-সরল, নম্রভাষী ও সদাচারী।[১৮]

তবে একটি কথা জেনে রাখা ভালো। নম্রতা মানে এই না যে, আপনি মনে করবেন মহান আল্লাহ আপনাকে কিছুই দেননি। বিনয় বা নম্রতার মানে হলো, নিজেকে অন্যের চেয়ে বড়ো ভাববেন না। অন্যকে অবজ্ঞা করবেন না। আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন, সেটার শুকরিয়া আদায় করবেন। একই সাথে নিজেকে 'মহান' ভাববেন না।

নিজেকে ছোটো মনে করলে কী হবে? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে অন্যের চেয়ে খাটো ভাবলে কী হবে? একবার নবিজি মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এক স্তর বিনয়ী হবে (এই বলে তিনি একটি হাত নিচের দিকে নামালেন), আল্লাহ তাঁর মর্যাদা এক স্তর উঁচু করবেন (এই বলে তিনি একটি হাত ওপরের দিকে ওঠালেন)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে এক স্তর অহংকার করবে, আল্লাহ তার মর্যাদা এক স্তর নিচু করে দেবেন; শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে হীনগ্রস্তদের মধ্যে হীনতমে পরিণত করবেন।[১৯]

---

[১৭] জামে আত-তিরমিজি : ২৭৫৪

[১৮] জামে আত-তিরমিজি : ২৪৮৮

[১৯] মুসনাদে আহমাদ : ২৭৩২৪; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৭৬

এ কথা সত্য, যদি বিনয়ী হন, সবাই আপনাকে পছন্দ করবে। আর যদি জোর করে সবার ভালোবাসা, সম্মান আদায় করতে চান; ব্যর্থ হবেন। আপনার ক্ষমতার জন্য আপাত কেউ কেউ আপনাকে সম্মান দেখাতে পারে। কিন্তু মনে মনে তারা সম্মান করবে না; বরং ঘৃণাই করবে।

মজার ব্যাপার হলো, যে বিনয়ী, সে নিজেকে ছোটো ভাবলেও মানুষজন তাকে বড়ো ভাবে। অন্যদিকে যে অহংকারী, সে নিজেকে বড়ো ভাবলেও মানুষজন তাকে নীচ মন-মানসিকতার ভাবে! নবি-রাসূলদের প্রত্যেকই বিনয়ী ছিলেন। বিনয় ছিল তাঁদের ভূষণ। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা সেই গুণ কীভাবে অর্জন করব?

অহংকারের পরিণতি নিয়ে ভাবা

আমরা অহংকারের পরিণতি নিয়ে ভাবতে পারলে স্বভাবতই খুব সহজেই বিনয়ী হতে পারব। যখন জানব ইবলিস, ফেরাউন, আবু লাহাবের পরিণতির কারণ ছিল তাদের অহংকার, তখন আমরা সেই বদ গুণ থেকে দূরে থাকতে পারব। নবিজি বলেন, যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[২০] অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি আমাদের নিরহংকারী হওয়ার উৎসাহ জোগাতে পারে।

অন্তরকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা

কখনো যদি মনে হয় আপনার অন্তর অহংকারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, অবশ্যই তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তখন ভাববেন, যে জিনিস নিয়ে অহংকার করছেন, সেটা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। আর তখন অহংবোধের সেই গরিমা অন্তরে কাজ করবে না। মনে মনে ভাববেন, আমি এটার যোগ্য না। তারপরও অনুগ্রহ করে আল্লাহ আমাকে তা দান করেছেন।

গোপন আমল

যখন কেউ আপনাকে দেখছে না; একাকী, নির্জনে আছেন—আপনি আমল করুন এবং গোপন আমল বাড়িয়ে দিন। তাহাজ্জুদ পড়ুন, নফল ইবাদত করুন। লুকিয়ে সাদাকা করুন; ডান হাতে দিলে যেন বাম হাত বুঝতে না পারে। মদিনায় যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যে ভাষণ দেন, সেখানে তিনি গোপন আমলের ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ বলেন, হে মানুষ! তোমরা ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় (তাহাজ্জুদ) নামাজ আদায় করো।[২১]

---

[২০] সহিহ মুসলিম : ১৬৭

[২১] জামে আত-তিরমিজি : ২৪৮৫

কোনো হালাল কাজকে অবজ্ঞা না করা

নবিজি নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন। তিনি চাইলে সাহাবিদের মধ্য থেকে একজনকে বলতে পারতেন। তাঁরা কখনোই না করতেন না। বিনা বাক্যে তাঁরা এ কাজ করে দিতেন। অথচ তিনি নিজের কাজটা নিজেই করেছেন। এ থেকে আমরা শিখতে পারি, নিজের কোনো হালাল কাজকে ছোটো করে দেখব না। আবার কাউকে সেটা করতে দেখলে তাকেও খাটো করব না।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তখন খলিফা। একবার তিনি পানির কলসি বহন করছিলেন। উরওয়া ইবনে জুবাইর (রহ.) খলিফাকে এই অবস্থায় দেখে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! এ কাজ আপনার শোভা পায় না। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, যখন প্রতিনিধিদল আনুগত্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমার কাছে আসে, আমার মনে একধরনের বড়োত্ব অনুভব হয়। তাই এই বড়োত্বকে ভেঙে ফেলা আমি জরুরি বলে মনে করছি।[২২]

গত শতাব্দীর একজন বড়ো আলিম ছিলেন আমার শিক্ষক। একবার সবাই দেখল সেই আলিম মসজিদের টয়লেট পরিষ্কার করছেন। তারা অবাক হলো। তাঁর ছেলে বলল—আব্বা, এসব কী করছেন? এসব করার জন্য তো লোক রাখা আছে। তিনি একই কথা বললেন, যে কথা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছিলেন, আমি আমার মনে একধরনের বড়োত্ব অনুভব করেছি। তাই এই বড়োত্বকে ভেঙে ফেলা আমি জরুরি বলে মনে করছি। নবিজি, সাহাবি এবং বড়ো বড়ো আলিমগণ এমন ছোটোখাটো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন না।

গরিব, দুর্বলদের সঙ্গে সময় কাটানো

যদি অসহায়, গরিব, দুর্বলদের সঙ্গে আপনি সময় কাটান, দেখবেন খুব সহজেই বিনয়ী হতে পারবেন। নবিজি বলেন, আমাকে খোঁজ করো তোমাদের মধ্যে যারা নিঃস্ব-দুর্বল তাদের মাঝে। কেননা, তোমরা অসহায়-দুর্বল লোকদের ওসিলায় রিজিক ও সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকো।[২৩]

আপনি সারাক্ষণ শুধু ধনী আর বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে চলাফেরা করবেন না। মাঝেমধ্যে গরিবদের সাথেও সময় কাটান। তাদের কষ্ট অনুভব করার চেষ্টা করুন। সমাজের মানুষজন যাদের মূল্যায়ন করে না—তাদের কাছে যান, খোঁজখবর নিন। মাঝেমধ্যে এতিমখানায় ঘুরে আসুন। দেখবেন—আপনার মাঝে নম্রতা, বিনয় চলে আসবে।

---

[২২] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, *মাদারিজুস সালিকিন* : ২/৩৩০

[২৩] *জামে আত-তিরমিজি* : ১৭০২

সত্যবাদিতা

মুমিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ সত্যবাদিতা। আপনি একজন নিয়মিত মিথ্যাবাদী হলে মুমিন হতে পারবেন না। মুমিন কখনো অনবরত মিথ্যা বলতে পারে না। সূরা আহজাবে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতবাসীদের কিছু গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সত্যবাদিতা। তিনি বলেন—

> 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজাদার পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী; তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান (জান্নাত) প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[২৪]

আপনি সত্যবাদী হলে কিয়ামতের দিন সত্যবাদিতা আপনার কাজে আসবে। সততার জন্য আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'এটা হলো সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সততা উপকার করবে।'[২৫]

তিনি আরও বলেন—

> 'আল্লাহ সত্যবাদীদের তাদের সততার জন্য পুরস্কৃত করতে পারেন।'[২৬]

আল্লাহ আমাদের সত্য বলার নির্দেশ দেন, সত্য বলতে উৎসাহিত করেন। একইভাবে আমাদের বন্ধু কারা হবে তাদের সম্পর্কেও বলেন। আমরা যেন মিথ্যাবাদীদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করি, সে ব্যাপারে সতর্ক করে তিনি বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।'[২৭]

---

[২৪] সূরা আহজাব : ৩৫
[২৫] সূরা মায়েদা : ১১৯
[২৬] সূরা আহজাব : ২৪

আমরা মিথ্যাবাদীদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে তাদের সাথে থাকতে থাকতে একসময় আমরাও মিথ্যা বলা শুরু করব। এজন্য আমাদের বন্ধু কারা, সেটা যাচাই করতে হবে। যদি দেখা যায় বন্ধুরা অনবরত মিথ্যা বলছে, দ্রুতই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।

নবিজি বলেন—সত্য নেকির দিকে পরিচালিত করে আর নেকি জান্নাতে পৌঁছায়। মানুষ সত্যের ওপর কায়েম থেকে অবশেষে 'সিদ্দিক'-এর দরজা লাভ করে। মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে নিয়ে যায় জাহান্নামে। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়।[২৮]

সত্যের পথ জান্নাতে, মিথ্যার পথ জাহান্নামে। আপনি অনবরত মিথ্যা বলা শুরু করলে সেই মিথ্যা আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) নাজ্জাশির সামনে ইসলামের বার্তা তুলে ধরেন। তিনি ইসলামের পাঁচটি বার্তা এক এক করে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল, নবিজি আমাদের সত্য বলতে নির্দেশ দেন।

এ কথা সর্বতোভাবে স্পষ্ট, সর্বাবস্থায় আমাদের অবশ্যই সত্য বলতে হবে। কোনো কিছু বলার আগে সত্যতার ব্যাপারটি যাচাই করে নিতে হবে। তবে তিনটি ক্ষেত্রে কথা বলার সময় আমাদের অতিরিক্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত করতে হবে, যা যা বলছি বা করছি সেসব ক্ষেত্রে আমরা সত্য কথা বলছি।

দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলা

ইসলামের যেকোনো বিষয়ে আমরা যখন আলোচনা করব, শতভাগ নিশ্চিত হয়েই তা করব। এ নিয়ে কখনোই মিথ্যাচার করতে পারব না। আলোচনার বিষয়ানুযায়ী আমার স্বল্পজ্ঞান থাকতেই পারে, সেটা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেব। তবে না জেনে কিংবা আলোচনার বিষয় নিয়ে বোঝাপড়া না থাকলে আর সামনের দিকে এগোব না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার ওপর নির্ভর করে বলো না এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলকাম হবে না।'[২৯]

---

[২৭] *সূরা তাওবা : ১১৯*

[২৮] *সহিহ বুখারি : ৬০৯৪*

[২৯] *সূরা নাহল : ১১৬*

আল্লাহ এবং নবিজির ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে হলে জেনেশুনে বলতে হবে। নিজের মনগড়া কোনো কথা বলা যাবে না। রাসূলুল্লাহ বলেন, তোমরা আমার ওপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ, আমার ওপর যে মিথ্যারোপ করবে, সে জাহান্নামে যাবে।[৩০]

যদি বলি 'এটা রাসূলুল্লাহ বলেছেন' বা 'এটা হাদিসে আছে' তাহলে নিশ্চিত তথ্যসূত্র জেনে বলতে হবে। নিজেদের বানানো কোনো কথাকে নবিজির নামে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। যারা এমন করে, তাদের স্থান জাহান্নামে।

আল্লাহর নামে কসম করে মিথ্যা বলা

মিথ্যা বলাই তো চরম গুনাহের কাজ, আল্লাহর নামে কসম করে মিথ্যা বলা তার চেয়েও বেশি ভয়ানক। আপনি কারও সাথে কথা বলার সময় আল্লাহর কসম বা ওয়াল্লাহি বলার পর মিথ্যা বললে আপনার কবিরা গুনাহ হবে। এটা বিশেষভাবে কোনো মামলা-মোকদ্দামা ব্যাপারে আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় দেখা যায়।

ব্যাবসার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা

ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার্জনের জন্য বেশির ভাগ সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তারা বলে—পণ্যটি ১০০০ টাকা দিয়ে কিনেছি, কিন্তু আপনার কাছে একদমই কেনা দামে বেচে দিচ্ছি। অথচ দেখা যায়, পণ্যটি তারা কিনেছে ৭০০ টাকায়, আর বিক্রি করছে ৩০০ টাকা লাভে। মনে মনে তারা ভাবছে, মিথ্যা বলার কারণে তার ৩০০ টাকা লাভ হয়েছে। কিন্তু মিথ্যা বলার দরুন যে তার ব্যবসায় বরকত কমে গিয়েছে, সেটা সে বুঝতেই পারে না।

এ ব্যাপারে নবিজি বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যদি সত্য বলে এবং পণ্যের অবস্থা ব্যক্ত করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হবে।[৩১]

সততার সাথে ব্যাবসা করলে ব্যবসায় যেমন লাভ হবে, তেমনই আল্লাহ সেই ব্যবসায় বরকত দান করবেন। আর মিথ্যাকে পুঁজি করে ব্যাবসা করলে মানুষজন একসময় না একসময় আপনার প্রতারণা ধরে ফেলবে। তখন আপনি দুনিয়াতে অপদস্থ তো হবেনই, আখিরাতেও এর ফল ভোগ করবেন।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। সেসব ক্ষেত্রে ইসলাম মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াকে অনুমতি দিয়েছে। যেমন : স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক।

---

[৩০] সহিহ বুখারি : ১০৬

[৩১] সহিহ বুখারি : ২০৭৯

স্বামী তার স্ত্রীকে এমন একটি কথা বলল, যা মূলত সত্য নয়। তবে এই কথাটি তাদের মধ্যকার বন্ধন বাড়াবে, মোহনীয় সম্পর্কের নতুন স্রোত বয়ে আনবে। এসব ক্ষেত্রে এমন মিথ্যা বলা ইসলাম সমর্থন করে। যেমন : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তোমার হাতের বিরিয়ানি পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু বিরিয়ানি। আর তুমি যেভাবে গরুর গোশত রান্না করো, আমি পৃথিবীর আর কোথাও গোশতের এমন স্বাদ পাইনি। কিংবা একটি সুন্দর মুহূর্তে স্বামী স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলল, তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে।

ইসলাম এসব মিথ্যাকে 'মিথ্যা' বলে মনে করে না। আপনি আপনার বাচ্চাদের প্রশংসা করেও এমন কিছু বলতে পারেন। তবে এমন মিথ্যার মাত্র যেন বেশি না হয়।

দুজন মানুষের মধ্যে মন কষাকষি হলে তাদের একত্র করতে প্রয়োজনে মিথ্যা বলা যেতে পারে। যেমন : একজনকে বলতে পারেন, অমুক তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে ঠিকই, কিন্তু সে অনুতপ্ত হয়েছে। সে আমাকে বলল, তোমার সাথে কথা বলতে চায়। আবার অন্যজনকে গিয়ে বলুন, অমুক সেদিন যেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, পরে এটার জন্য কষ্ট পেয়েছে। এখন সে চাচ্ছে তোমার সাথে কথা বলতে। চলো, তার সাথে গিয়ে কথা বলি।

এসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতে অসুবিধা নেই। নবিজি তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমোদন দিয়েছেন। সেগুলো হলো—

১. একজনের সাথে আরেকজনের মন কষাকষি মিটিয়ে দেওয়ার সময়।

২. যুদ্ধের সময় এবং

৩. স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার সম্পর্ক মজবুত করতে মিথ্যার আশ্রয় নিলে।[৩২]

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, সত্য বললে কী লাভ?

যখন সত্য বলবেন, সেই সত্য বলার মাধ্যমে নেকি অর্জন করবেন। আর যখন কিছু লিখবেন, তা যদি সঠিক হয় তবেই নেকি অর্জন করবেন। সত্য বললে আপাতদৃষ্টিতে আপনার কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হলেও এর সুবিধা ভোগ করতে পারবেন দীর্ঘকাল।

কাব ইবনে মালেক (রা.)-এর ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার অজুহাত দেখাতে কেউ কেউ যখন মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি সত্যের ওপর অটল থাকেন। মিথ্যা বলাতে অনেকের অজুহাত গ্রহণ করা হয়েছিল, এদিকে সত্য বলায় তিনি পড়েছিলেন বিপদে। কিন্তু পরবর্তী

---

[৩২] মুসনাদে আহমাদ : ২৬৭৩১

সময়ে এই সত্যবাদিতা তাঁকে পুরস্কৃত করে। এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘটনা উল্লেখ করে কুরআনেও কয়েকটি আয়াত নাজিল করেন।[৩৩]

যখন মনে করবেন আল্লাহ আপনাকে দেখছেন, সবকিছু শুনছেন, তখনই আপনি সত্য বলতে পারবেন। কারণ, আপনিই আপনার ব্যাপারে অধিক জানেন। আর অন্য কেউ জানুক বা না জানুক, আল্লাহ জানেন প্রকৃত ঘটনা মূলত কী। আল্লাহ আপনাকে দেখছেন, ফেরেশতারা পর্যবেক্ষণ করছেন এই বোধ থাকলে জীবনের যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে আপনি কখনোই মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না।

জান্নাতে যেতে চাইলে, আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে চাইলে সব সময় সত্য কথা বলুন। কেননা, সত্যবাদীদের স্থান জান্নাতে, মিথ্যাবাদীদের স্থান জাহান্নামে।

---

[৩৩] সহিহ বুখারি : ৪৪১৮

ধীরস্থিরতা

অষ্টম হিজরির ঘটনা। বাহরাইনের একটি প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সাক্ষাৎ করতে আসে। কোনো ধরনের যুদ্ধ ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করে এই গোত্র। অর্থাৎ তারা ইসলাম সম্পর্কে জানামাত্রই রাসূলুল্লাহর কাছে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

সেই গোত্রের ১০-১৫ জনের একটি প্রতিনিধিদল মসজিদে নববিতে প্রবেশ করল। তারা নবিজির সঙ্গে দেখা করতে এতটা উদ্‌গ্রীব ছিল যে, মসজিদে প্রবেশের আগে উট বাঁধতে ভুলে গেল। ঢুকেই তারা নবিজির হাত-পায়ে চুমো খেলো। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বেশ ব্যতিক্রম। তাঁর নাম আশাজ্জ ইবনে কায়েস (রা.)। সবার সাথে বাহরাইন থেকে এলেও তিনি একসঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করেননি এবং বাকিরা যা যা করেছে, তা-ও তিনি করেননি।

আশাজ্জ (রা.) তাঁর উটটি বাঁধলেন। সফর করে ক্লান্ত থাকার ফলে গোসল করেন। সঙ্গ করে আনা দুটি জামা হতে পরিষ্কার দেখে একটি জামা পরলেন। আসার সময়ই তিনি নিয়ত করে এসেছিলেন—একটি সফরকালে আর অন্যটি নবিজির সাথে দেখা করার সময় পরবেন।

অতঃপর তিনি নবিজির সাথে দেখা করেন। যা যা জানা দরকার, খুব শান্ত-ধীর স্বরে এক এক করে প্রশ্ন করেন; অন্যদের মতো তাড়াহুড়ো করেননি। রাসূলুল্লাহ আশাজ্জ ইবনে কায়েসের এই গুণের প্রশংসা করে বলেন, হে আশাজ্জ! তোমার দুটি বিশেষ গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন। সেগুলো হলো—ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতা; ধীরস্থিরতা।

আশাজ্জ ইবনে কায়েস (রা.) নিজের প্রশংসা শুনে নবিজিকে একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই কি এই গুণ অর্জন করেছি নাকি আল্লাহ আমাকে এই দুটি গুণের ওপর সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাকে এই দুটি গুণের ওপর সৃষ্টি করেছেন।

এ কথা শুনে আশাজ্জ ইবনে কায়েস (রা.) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে এমন দুটি স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছেন; যাকে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন।[৩৪]

নবিজি আশাজ্জ ইবনে কায়েস (রা.)-এর চিন্তাভাবনা-ধীরস্থির করে কাজ করাটা পছন্দ করেন।

একজন মুমিন তাড়াহুড়ো প্রবণ হয়ে চিন্তাভাবনা ছাড়াই কোনো কাজ করে না। মনে যা চায়, হুটহাট চাইলেই তা করে ফেলতে পারে না। তার প্রতিটি কাজই হবে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও চিন্তামূলক। এই ব্যাপারে নবিজি বলেন—ধৈর্য ও স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়ো শয়তানের পক্ষ থেকে।[৩৫]

ধৈর্যের সহিত কাজ করলে আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন। তাড়াহুড়োর কাজে কোনো বরকত নেই। তবে দ্বীনি কোনো কাজের ব্যাপারে আমরা চটজলদি করতে পারি। যেমন : কাউকে দান করতে গেলে বেশি সময় ধরে ভাবার কারণ নেই। সে যদি দান গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তাকে দান করে দিন। আপনি নিয়ত করছেন দুই রাকাত নামাজ পড়বেন। সুযোগ পাওয়ামাত্রই পড়ে ফেলুন। গড়িমসি করে আজ পড়ব, কাল পড়ব বলে দেরি করার প্রয়োজন নেই। তাড়াহুড়ো প্রবণতার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ মানুষের সম্পর্কে বলেন—

'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়োর প্রবণতা দিয়ে।'[৩৬]

তাড়াহুড়ো করার কারণে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ মানুষের সমালোচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইউনুস (আ.)-এর কিছু ঘটনা।

ইউনুস (আ.) তাঁর কওমকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিলো না। বারবার চেষ্টা করেও যখন কোনো ফলাফল আসছে না, তখন তিনি তাঁর জনপদ ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যাওয়ার পূর্বে তাঁর কওমকে বলে যান, তিন দিনের মধ্যে আল্লাহর আজাব এসে উপস্থিত হবে।

তাঁর কওমের লোকেরা আল্লাহর আজাবের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল। তারা আল্লাহকে মেনে নিল। ফলে শিরক ত্যাগ করল এবং আল্লাহর কাছ থেকে আজাব মুক্তির দুআ করতে লাগল। আল্লাহ তাদের দুআ কবুল করে তাদের ওপর থেকে কঠিন আজাব উঠিয়ে নেন।[৩৭]

---

[৩৪] সহিহ মুসলিম : ২৫; সুনানে আবু দাউদ : ৫২২৫

[৩৫] জামে আত-তিরমিজি : ২০১২

[৩৬] সূরা আম্বিয়া : ৩৭

[৩৭] সূরা ইউনুস : ৯৮

অন্যদিকে ইউনুস (আ.) তাঁর কওমের ওপর রাগ করে সেই জনপদ থেকে চলে গিয়েছিলেন। এর জন্য তিনি আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করেননি। নবিগণের এমন সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহর অনুমতির প্রয়োজন হয়। তাঁরা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া হিজরত করতে পারেন না। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের জন্য নবিজিও আল্লাহর অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল।[৩৮]

অনুমতি ছাড়া ইউনুস (আ.)-এর এভাবে চলে যাওয়াকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ উল্লেখ করেন 'পালিয়ে যাওয়া' হিসেবে।[৩৯] ইউনুস (আ.) আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে তাড়াহুড়ো করেন। আর এমন তাড়াহুড়োর জন্য আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন।

অন্যদিকে ইউসুফ (আ.) জেলের মধ্যে ধৈর্যধারণ করেন। বাদশাহ ইউসুফ (আ.)-কে জেল থেকে মুক্তির আদেশ দিলেও তাঁর মধ্যে তাড়াহুড়োর প্রবণতা দেখা যায়নি। তিনি যে মিথ্যা মামলার আসামি হয়ে জেলে যান, ওই মামলা থেকে আগে মুক্তি পেতে চান। তাই তিনি বলেন—

> 'তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীরা হাত কেটেছিল, তাদের কী অবস্থা?'[৪০]

ইউসুফ (আ.)-এর এমন ধৈর্যশীল অবস্থান এবং ধীরস্থিরতার ব্যাপারে জেনে স্বয়ং নবিজিও অবাক হন। তিনি ইউসুফ (আ.)-এর প্রশংসা করে বলেন—ইউসুফ (আ.) যত দিন জেলে কাটিয়েছেন, যদি আমি ততদিন কাটাতাম! আর আমার কাছে বাদশার আহ্বানকারী আসত, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দিতাম।[৪১]

ইউসুফ (আ.) কেবল মুক্তির প্রস্তাব শুনেই জেল থেকে বের হননি। ফলে তিনি কলুষমুক্ত হয়েই বের হন। পরবর্তী সময়ে ওই বাদশাহ তাঁকে অর্থমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী বানান। প্রজ্ঞা ও ধীরে-সুস্থে কাজ করার ফলে তিনি হাতেনাতে এর ফলাফল ভোগ করেন।

মুসা ও খিজির (আ.)-এর ঘটনায় আমরা দেখেছি, মুসা (আ.) বেশিক্ষণ ধৈর্যধারণ করতে পারেননি। তিনটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেই তিনি খিজির (আ.)-কে প্রশ্ন শুরু করেন। ফলে খিজির (আ.) ওই সময় তাঁদের শিক্ষা সফরের সমাপ্তি ঘটান। ঘটনাগুলো বর্ণনার সময় নবিজি মন্তব্য করেন, আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.)-এর ওপর

---

[৩৮] সহিহ বুখারি : ২১৩৮

[৩৯] সূরা আস-সফফাত : ৪০

[৪০] সূরা ইউসুফ : ৫০

[৪১] সহিহ বুখারি : ৬৯৯২

রহম করুন। আমাদের কতই-না মনোবাঞ্ছনা পূরণ হতো, যদি তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। তাহলে আমাদের নিকট তাঁদের আরও ঘটনাবলি বর্ণনা করা হতো।[৪২]

নবিজি আমাদের কোনো কাজের বিষয়ে তাড়াহুড়ো করতে যেমন নিষেধ করেন, তেমনই তাঁর স্ত্রীদেরও নিষেধ করেন। একবার নবিজির স্ত্রীগণ তাঁর কাছে দুনিয়াবি চাহিদার দাবি করেন। কিন্তু নবিজি সোজা জানিয়ে দেন, তিনি এমন জীবনযাপন পছন্দ করেন না। এর দরুন তিনি প্রায় এক মাস স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল করে এই বিষয়ের মীমাংসা করেন। তিনি বলেন—

> 'হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন—যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করো, তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং তোমাদের উত্তম পন্থায় বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালীন নিবাস কামনা করো, তোমাদের মধ্য থেকে সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ অবশ্যই মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[৪৩]

নবিজি প্রথমে তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.)-কে বললেন, আমি তোমার কাছে একটি বিষয় উপস্থাপন করছি। তোমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ না করা পর্যন্ত তুমি তাড়াহুড়ো করো না। তাড়াহুড়ো করলে তোমার লোকসান হবে। কেননা নবিজি আশঙ্কা করছিলেন, আয়িশা (রা.) তাড়াহুড়ো করে যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে যান! তাঁকে কুরআনের দুটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনানোর পর আয়িশা (রা.) জবাব দেন, এই ব্যাপারে আবার আমার মা-বাবার সাথে কী পরামর্শ করব? আমি তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও আখিরাতকেই বেছে নিচ্ছি।[৪৪]

এই ঘটনার মাধ্যমে এ কথা প্রতীয়মান হয়, নবিজি তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.)-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাড়াহুড়ো করতে নিরুৎসাহিত করেন এবং মা-বাবার পরামর্শ নিতে বলেন। যদি তিনি তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতেন, ভুল হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

আমরা সব সময় যেকোনো সিদ্ধান্তই ভেবেচিন্তে এবং যথেষ্ট বোঝাপড়ার পর নেব। তাড়াহুড়ো করব না। তবে তিনটি ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে। একেবারেই তাড়াহুড়ো করা যাবে না। সেগুলো হলো—

---

[৪২] সহিহ বুখারি : ১২২

[৪৩] সূরা আহজাব : ২৮-২৯

[৪৪] সহিহ মুসলিম : ৩৫৭৩

নামাজের সময় : আমরা যখন নামাজ পড়ব, তাড়াহুড়ো করা যাবে না। এমনকি নামাজে যাওয়ার সময় রাস্তায় দৌড়াতে পারব না। ধীরে-সুস্থে যেতে হবে।

আয়িশা (রা.) নবিজিকে নামাজের ভেতর এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন—এটা একধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামাজ হতে অংশবিশেষ ছিনিয়ে নেয়।[৪৫] নামাজ আদায়ের সময় আপনি বুঝে-শুনে, সঠিক তিলাওয়াতের মাধ্যমে ধীরে-সুস্থে পড়বেন। তাড়াহুড়ো করবেন না, এদিক-সেদিক তো তাকাবেনই না।

দুআর ক্ষেত্রে : নবিজি বলেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দুআ কবুল হয়ে থাকে; যদি সে তাড়াহুড়ো না করে আর বলে—আমি দুআ করলাম কিন্তু আমার দুআ তো কবুল হলো না।[৪৬]

অনেকেই দুআ করার পরই অধৈর্য হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক দুআর ফল পেতে চায়। এমনটা করলে আল্লাহ রাগ হন, দুআ কবুল করেন না। আপনি আপনার চাওয়ামতো দুআ করে যাবেন; কবুল হোক বা না হোক।

কারও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে : কারও ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে গ্রহণের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো প্রবণ হওয়া যাবে না। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু জায়গায় এই ব্যাপারে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। আর কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নিলে যেন ভালোভাবে যাচাই-বাছাইয়ের পর সেটা করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে মুমিনগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও এই আশঙ্কায়, তোমরা অজ্ঞতাবশত হয়তো কোনো কওমকে আক্রমণ করে বসবে। ফলে পরবর্তী সময় তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।'[৪৭]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

> 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে, যাচাই করে নেবে এবং যে তোমাদের সালাম দেবে দুনিয়ার জীবনের সম্পদের আশায়, তাকে বলবে না যে, তুমি মুমিন নও।'[৪৮]

---

[৪৫] সহিহ বুখারি : ৭৫১

[৪৬] সহিহ বুখারি : ৬৩৪০

[৪৭] সূরা হুজুরাত : ৬

[৪৮] সূরা নিসা ৪ : ৯৪

আমরা কোনো সংবাদ শুনলে যেমন যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেব, তেমনই কাউকে যদি কিছু করতে দেখি, তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জেনে নেব—সে এ কাজটা কেন করছে। নবিজির জীবনে এ রকম একটি ঘটনা দেখতে পাই। মক্কা বিজয়ের পূর্বে একজন বদরি সাহাবি (তাঁর নাম ছিল হাতিব ইবনে আবু বালতাআ রা.) মুসলিমদের মক্কা অভিযানের সংবাদ চিঠিতে লিখে মক্কায় জানিয়ে দিতে চান।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এটি মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। মক্কায় আগাম সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন। চিঠিটি তিনি একজন মহিলার কাছে দেন। তা নিয়ে মহিলা মক্কার উদ্দেশে রওনা হন।

নবিজি ওহি মারফত খবরটি জানেন। তারপরও আলি ইবনে আবু তালিব ও জুবাইর ইবনে আবু বালতাআ (রা.)-কে পাঠালেন চিঠিটি উদ্ধার করতে। উদ্ধারের পর নবিজি হাতিব (রা.)-এর কাছে কারণ জানতে চান। তিনি বলেন—তাঁর পরিবার মক্কায় আছে, কুরাইশদের আগাম সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন এই আশায় যে, মক্কায় আক্রমণ হলে তারা যেন তাঁর পরিবারকে সুরক্ষা দেয়।

হাতিব (রা.)-এর চিঠি প্রেরণের কারণ জানার আগপর্যন্ত মনে হতে পারে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কিন্তু বিস্তারিত খুলে বলার পর মনে হয়, তিনি মূলত তাঁর পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তার দরুন চিঠি পাঠিয়েছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ক্ষমা করে দেন।[৪৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহি লাভের সাথে সাথেই হাতিব ইবনে আবু বালতাআকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেননি। তাড়াহুড়োও করেননি; বরং এর কারণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন।

তালাকের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, অনেকেই মেজাজ বিগড়ে বা কোনো প্রকার না ভেবেই তাড়াহুড়ো করে রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক দেয়। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর যদি তারা তালাকের দৃঢ় ইচ্ছা করে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৫০]

তালাকের 'দৃঢ় ইচ্ছা' কখন করা হয়? এটা কি রাগের মাথায়, তাড়াহুড়ো করে হয়? দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের সমাজে বেশির ভাগ তালাক হয় তাড়াহুড়োর ফলে রাগের মাথায়!

---

[৪৯] সহিহ বুখারি : ৬৯৩৯; *সিরাত ইবনে হিশাম* : ৪/৩৭-৩৮; *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/৪৮৮-৪৮৯

[৫০] সূরা বাকারা : ২২৭

একবার এক লোক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে রাগের মাথায় এক হাজার তালাক দিয়ে ফেলেছি। এখন কী করব? উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তুমি তাড়াহুড়ো করে এমন এক কাজ করেছ, যা তোমার ধ্বংস ডেকে এনেছে! এখন এসেছ আমার কাছে ফতোয়া জানতে?

বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে কখনো তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। এসব ক্ষেত্রে অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রশ্ন হলো, আমরা কীভাবে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তগুলো নেব?

১. আপনি যখন রাগান্বিত থাকবেন, তখন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

২. যখন কোনো কিছুর সংবাদ পাবেন, সাথে সাথে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন না। সময় নিন। সংবাদটি ভালোভাবে যাচাই করে নিন। ফেসবুকে বা উড়ো সংবাদে অনেক সময় মানুষ মিথ্যা গুজবের ওপর ভিত্তি করে অনেক বড়ো বড়ো লেখা লেখে। পরে পস্তাতে হয়। অথচ খানিক সময় নিলে এর আসল সত্যতা জানা যেত।

৩. পরামর্শ গ্রহণ করুন। বড়ো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সমঝদার এমন কারও সাথে আলোচনার মাধ্যমে অবশ্যই পরামর্শ গ্রহণ করুন; যেমনটা নবিজি আয়িশা (রা.)-কে বলেছেন মা-বাবার পরামর্শ নিতে।

৪. বড়ো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ইস্তিখারা করুন। নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তাহলে দেখবেন সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে।

একজন মুমিন হুজুগে কোনো কাজ করে না। সে অবশ্যই ভেবেচিন্তে, পরামর্শ নিয়ে, ইস্তিখারার প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে কাজ করে।

প্রজ্ঞা

পূর্বের আলোচনার মাধ্যমে আমরা জেনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাজ্জ ইবনে কায়েস (রা.)-এর দুটি গুণ পছন্দ করেন। তন্মধ্যে একটি হলো 'হিলম'। হিলম শব্দের আবার দুটি অর্থ। দুই অর্থে দুটি গুণ বোঝায়।

১. প্রজ্ঞা ও

২. রাগ নিয়ন্ত্রণ।

এখন আমরা আলোচনা করব প্রজ্ঞা নিয়ে। এটি এমন এক গুণ, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন। এটি মুমিনের আখলাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে একটি হলো, আল হাকিম। এর অর্থ করলে দাঁড়ায়—প্রজ্ঞাবান।

প্রজ্ঞার আরবি হলো 'হিকমা'। যে জিনিস যেখানে থাকার কথা, সেখানে রাখা বোঝাতে আরবরা হিকমা শব্দটি ব্যবহার করে। আলিমগণ হিকমার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন—কোনো কিছু এমনভাবে করা, যার ফলে ক্ষতি কমানো এবং লাভ বাড়ানো যায়। অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য এমন কিছু করা, যার ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভ হয় বেশি, ক্ষতি হয় কম। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। যাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেওয়া হয়। আর বিবেকবানরাই এ উপদেশ গ্রহণ করে।'[৫১]

আল্লাহ লুকমান (আ.)-কে প্রজ্ঞা দান করেন। তিনি বলেন—

> 'আমি লুকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। আর বলেছিলাম, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।'[৫২]

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিকমা দান করতে পারেন। এখন কারও মনে এ প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে—আল্লাহ যেহেতু আমাকে হিকমা দান করেননি, আমারই-বা

---

[৫১] সূরা বাকারা : ২৬৯

[৫২] সূরা লুকমান : ১২

কী করার আছে? পূর্বের আলোচনায় আমরা জেনেছিলাম, চরিত্রের কিছু অংশ আল্লাহ দান করেন। আর কিছু অংশ অর্জন করে নিতে হয়। আল্লাহ আপনাকে হিকমা দান করেননি। তার মানে এই না, সেটা অর্জন করতে পারবেন না।

প্রত্যেকের যেমন শক্তিমত্তা আছে, তেমনই আছে দুর্বলতাও। আল্লাহ একেকজনকে একেকভাবে সৃষ্টি করেছেন। এমনটা কখনোই হতে পারে না, আপনাকে যে গুণ দেওয়া হয়নি সেটা অর্জনের চেষ্টা করবেন না। স্বভাবত যদি কোনো চারিত্রিক গুণ না-ই থাকে, তাহলে আপনি সেটা অর্জনের চেষ্টা করবেন। একইভাবে আমরা হিকমা বা প্রজ্ঞার গুণও অর্জন করতে পারি। কীভাবে? কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ আমাদের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি বাতলে দেন। তিনি নির্দেশ দেন—

> 'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো। নিশ্চয়ই একমাত্র তোমার রবই জানেন, কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন।'[৫৩]

যদি এমন হতো—প্রজ্ঞার গুণ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সেই গুণ অর্জন করতে পারব না, তাহলে আল্লাহ আমাদের এভাবে বলতেন না। তিনি যেহেতু প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াত দিতে বলেছেন, তাই এ গুণ আমাদের মধ্যে না থাকলেও আমরা সেটা অর্জন করতে পারি।

হিকমার অনেকগুলো ভাগ আছে। সেগুলো হলো—

দ্বীনের ব্যাপারে হিকমা

শ্রেষ্ঠ হিকমা হলো দ্বীনের ব্যাপারে হিকমা। এই হিকমা মানে হলো—শরিয়ায় যেভাবে বলা আছে, ঠিক সেভাবে জীবনযাপন করা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, প্রজ্ঞার মূলভিত্তি হলো আল্লাহকে ভয় করা।[৫৪] আপনি যখন বুঝবেন আপনাকে কে সৃষ্টি করছে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কী কী করতে হবে, তবে সেটাই হবে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

> 'নিশ্চয় তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।'[৫৫]

---

[৫৩] সূরা নাহল : ১২৫

[৫৪] ইমাম বায়হাকি, *শুআবুল ঈমান* : ৭১২

[৫৫] সূরা নিসা : ১৭

সাহাবিগণ বলতেন, আল্লাহর বান্দা যে গুনাহের কাজ করে, তা তারা না জানার কারণে অজ্ঞতাবশতই করে।[৫৬] সাহাবিগণ আরও বলতেন—বান্দা যে গুনাহই করুক, সেটা হোক ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত, তা তারা অজ্ঞতাবশত করে।[৫৭]

আপনি যদি কেবল আল্লাহর আদেশ-নির্দেশও মেনে চলেন, তাহলে আপনি প্রজ্ঞাবান। আর যদি আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন, তাহলে আপনি অজ্ঞ। এখানে প্রজ্ঞার বিপরীত হলো অজ্ঞতা।

মানবজাতির সাথে হিকমার সহিত আচরণ

আপনি কারও সাথে কথা বলা এবং লেনদেন করার সময় হিকমার সাথে করবেন। এমনকি শত্রুর সাথেও একই আচরণ করবেন। এর ফলে আপনার সম্পর্ক দারুণভাবে গড়তে পারে। অন্যদিকে এর অভাবে সম্পর্ক ভাঙতেও পারে। কিছু কিছু সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মূল কারণ, নিজ জীবনে হিকমার বাস্তবায়ন না করা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, অফিসের কর্মকর্তা-মালিকের সম্পর্ক ভেঙে যায় এই হিকমা বা প্রজ্ঞার সহিত কাজ না করার ফলে।

হিকমা অবলম্বন করে ব্যাবসা

এক্ষেত্রেও হিকমার প্রয়োজন। আপনি যখন ব্যাবসার উদ্দেশ্যে কিছু কিনবেন, বুঝে-শুনে কিনবেন। একই কথা বিক্রির বেলায়ও শিরোধার্য। এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে আমরা হিকমা অর্জন করতে পারি? কীভাবে প্রজ্ঞাবান হতে পারি?

ক. আল্লাহর কাছে চাইতে হবে : যেকোনো কিছুই পেতে হলে সবার আগে চাইতে হবে আল্লাহর কাছে। আপনি যদি সমস্ত আবেগ ঢেলে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে চান, অবশ্যই তিনি তা দান করবেন। নবিজি তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন—হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে হিকমা শিক্ষা দিন।[৫৮]

এমন না যে ইবনে আব্বাস (রা.) ওই সময় জন্মগ্রহণ করেননি বা তিনি ছোটো ছিলেন। তখন তিনি কিশোর। নবিজি সেই অবস্থায় তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন, আল্লাহ যেন তাঁকে হিকমা শিক্ষা দেন এবং প্রজ্ঞাবান বানান। ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর কাছে দুআ করেন—'রাব্বি হাবলি হুকমা—হে আল্লাহ! আমাকে হিকমা দান করুন।'[৫৯]

---

[৫৬] *তাফসিরে তাবারি* : ৮/৮৯

[৫৭] *তাফসির ইবনে কাসির* : ২/৩০৯

[৫৮] সহিহ বুখারি : ৩৭৫৬

[৫৯] সূরা শুআরা : ৮৩

খ. জ্ঞানার্জন : আপনি যদি প্রজ্ঞার গুণ অর্জন করতে চান, জ্ঞানার্জন করতে হবে। একমাত্র এর মাধ্যমেই আপনি প্রজ্ঞাবান হতে পারেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা একটি দুআর উল্লেখ করেন—

> 'হে আমাদের রব! তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন এবং কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেবেন; আর তাদের পবিত্র করবেন।'[৬০]

কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জন করে দ্বীনের প্রজ্ঞা হাসিল করতে পারি। এ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে আমরা সেসব বিষয়ের বইপত্র পড়ে প্রজ্ঞাবান হতে পারি।

গ. অভিজ্ঞতা : উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রজ্ঞা অর্জন করা যায় না।

অনেক সময় দেখবেন, কিশোর-যুবকরা ভাবনা-বিচার ছাড়াই হুট করে একটি কাজের আঞ্জাম দিয়ে ফেলে। তাদের তো অভিজ্ঞতা নেই। ওই ব্যাপারে তারা এখনও সাবালক হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেরা ভাবনাচিন্তা ব্যতীত কোনো কাজ করে না। কেননা, অভিজ্ঞতা আপনাকে এমন কিছু শেখাবে, যা বই কখনো পারবে না।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে

আপনি দিল খোলা রেখে কোনো কিছুকে একনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সেখান থেকে অনেক কিছু না হোক, কিছু শিখতে পারবেন। আশপাশের সমাজ, পাড়াপড়শি এবং নানান মানুষের কাছ থেকে তাদের কাজের নিরিখ অবলোকন করেও প্রজ্ঞাবান হতে পারবেন। তখন নিজেই বুঝতে পারবেন, প্রজ্ঞার সাথে কোন কাজ কীভাবে করতে হয়। কিন্তু যদি অহংকারী হন, তাহলে আপনাকে দিয়ে হবে না। কোনো কিছুই আপনি শিখতে পারবেন না। আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ বলতেন, প্রজ্ঞাবান সে, যে অন্যের ভুল দেখে শেখে, অন্যরা তার ভুল দেখে শেখার আগে।

একই ভুল একজন করেছে। আপনি শিখেছেন। ভুল করেননি। কিন্তু আপনিও যদি ওই একই ভুল করেন, তাহলে তো আর প্রজ্ঞাবান হতে পারলেন না। দ্বীনি ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান হতে চাইলে প্রজ্ঞাবান আলিমের সাহচর্যে থাকুন। আর ব্যাবসার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান হতে চাইলে প্রজ্ঞাবান ব্যবসায়ীর সাথে থাকুন।

---

[৬০] সূরা বাকারা : ১২৯

ইতিহাস পাঠ

ইতিহাস পড়লে মানবজাতির উত্থান-পতনের বিস্তারিত ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারবেন। বুঝতে পারবেন, কোন কোন কর্মের বদৌলতে একটা জাতি বা বিশেষ কোনো ব্যক্তির পতন হয়েছে। অপর দিকে কীভাবে একটা জাতি সভ্যতার উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে এবং কোন কোন আদর্শ ব্যক্তিজীবনে লালনের পর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা সফল হয়েছেন। আপনার বাস্তব জীবনে সুফল বয়ে আনা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে ইতিহাস পাঠ সহায়ক হবে। ইতিহাসের গভীর পাঠে মগ্ন হলে বহু ঘটনা অতীতের সাথে বর্তমানের মিল খুঁজে পাবেন। আমাদের ব্যাবহারিক ও বাস্তবিক জীবনে প্রজ্ঞাবান হওয়ার ক্ষেত্রে ইতিহাস পাঠ ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

রাগ নিয়ন্ত্রণ

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা 'হিলম' নিয়ে আলোচনা করেছি। হিলমের দুটি অর্থ নিয়েছিলাম—প্রজ্ঞা আর রাগ নিয়ন্ত্রণ। এখন আমরা রাগ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করব।

আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে একটি হলো—আল হালিম। আল্লাহর ক্ষেত্রে আল হালিম মানে যিনি তাঁর সৃষ্টির ওপর রাগ নিয়ন্ত্রণ করেন, যদি না তাঁর সৃষ্টি রাগ করার মতো কিছু করেছে। অর্থাৎ, মানুষ এমন কোনো কাজ করেছে, যার ফলে আল্লাহ মানুষের ওপর রাগান্বিত হতে পারেন। কিন্তু তিনি তো অসীম দয়ালু, রাগান্বিত না হয়ে বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। এজন্যই তাঁকে বলা হয় আল হালিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। লোকেরা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, এরপরও তিনি তাদের বিপদমুক্ত রাখেন এবং রিজিক দান করেন।[৬১] আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নিজেকে বেশ কয়েকবার 'হালিম' বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন—

> 'তোমরা তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল (হালিম)।'[৬২]

আল্লাহ হলেন আল হালিম। তিনি রাগ করার মতো এমন কোনো কাজ বান্দা করলেও রাগান্বিত হন না। আল্লাহ যেমন আল হালিম, তেমনই যারা এই গুণে গুণান্বিত তিনি তাদের প্রশংসা করেন। পবিত্র কুরআনে নবি ইবরাহিম (আ.)-এরও প্রশংসা করেন। কারণ, তিনি ছিলেন এই গুণে গুণান্বিত।

নিজের রাগকে সংযত রাখা মুমিনের অন্যতম গুণাবলি। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই গুণের প্রশংসা করেন এবং যারা নিজেদের রাগ সংযত করে, তাদের ব্যাপারে তিনটি পুরস্কারের ঘোষণা দেন। সেগুলো হলো—

১. ক্ষমা করে দেবেন।

---

[৬১] সহিহ বুখারি : ৬০৯৯

[৬২] সূরা বাকারা : ২৩৫

২. জান্নাত দান করবেন এবং

৩. মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.
الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

'তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (এগুলো তাদের জন্য) যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে, রাগ সংবরণ এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[৬৩]

এখানে উল্লেখ্য, যারা রাগ সংবরণ করে তাদের কথা বোঝাতে আল্লাহ যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা হলো—'কাজিমিনা গাইজা' (كَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ); তিনি 'কাজিমিনাল গাদাভ' (كَاظِمِيْنَ الْغَضَبَ) শব্দটি ব্যবহার করেননি। তবে শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?

ক. 'কাজিমিনা গাইজা' মানে হলো, যখন আপনি রাগান্বিত হওয়া শুরু করেন, তখনই সেটা নিয়ন্ত্রণ করেন।

খ. 'কাজিমিনাল গাদাভ' মানে হলো, আপনি রাগ করার পর একসময় তা নিয়ন্ত্রণ করেন।

এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন—যারা রাগ হওয়ার সাথে সাথেই তা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। এর মানে, আপনি রাগান্বিত হওয়ার পূর্বেই তা করবেন যেন আপনার রাগ 'গাদাভ' পর্যন্ত না পৌঁছায়। নবিজি বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে, তা অন্য কিছু সংবরণে নেই।[৬৪]

ধরা যাক, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যদি আপনি এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করেন, এর পর আপনার অনুভূতি কেমন হবে? আপনি কতটা সন্তুষ্ট হতে পারবেন? তদ্রূপ আপনার যদি রাগ ওঠে আর সেটা সংবরণ করেন, তা-ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

---

[৬৩] সূরা আলে ইমরান : ১৩৩-১৩৪

[৬৪] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৮৯

একবার জনৈক ব্যক্তি নবিজির কাছে পরামর্শ নিতে এলো। তিনি তাকে পরামর্শ দিলেন, রাগ করো না। লোকটি আরও উপদেশ নিতে চাইল। কিন্তু নবিজি প্রতিবারই তাকে বললেন, রাগ করো না।[৬৫] সে তখন বুঝতে পারল, নবিজি তাকে এই উপদেশই দিলেন। উপদেশ মাত্র একটি, কিন্তু গুরুত্ব অসীম।

পূর্বে আলোচনা করেছিলাম, হিলমের দুটি অর্থ হতে পারে। তবে এই দুটি গুণের মধ্যে একধরনের মিল আছে। যেমন : আপনি যদি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে প্রজ্ঞাবান হতে পারবেন না। প্রজ্ঞাবান হতে হলে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

একবার নবিজি সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেন, সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি কে? তাঁরা উত্তরে বললেন, যে কুস্তিতে অন্যকে পরাজিত করে। তখন রাসূলুল্লাহ বলেন— প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে পরাজিত করে; বরং সে-ই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে।[৬৬]

যে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, সে মূলত তিনটি শক্তির ওপর বিজয়ী হয়। সেগুলো হলো—

১. নিজের নফসকে পরাজিত করা।

২. নিজের সাথে থাকা শয়তানকে পরাজিত এবং

৩. তাকে যে রাগান্বিত করে, ওই লোকটির সাথে থাকা শয়তানকে পরাজিত করা।

আপনি যদি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে এক ঢিলে তিনটি পাখি শিকার করলেন!

নবিজির জীবনী পড়লে আপনি অবাক হবেন। দেখবেন, তাঁর জীবনে এত এত ঘটনা ঘটেছে এবং রাগান্বিত হওয়ার মতো অসংখ্য কারণও ছিল। কিন্তু তিনি নিজের রাগকে সাধারণভাবে প্রকাশ করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেছেন সূক্ষ্মভাবে।

আমরা দেখতে পাই, আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে শান্তশিষ্ট, তারাও মাঝেমধ্যে রাগান্বিত হয়। কিন্তু নবিজি ছিলেন এর ব্যতিক্রম। জীবনের কোনো সময়ে একটিবারের জন্যও তিনি নিজের রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাননি; তা পরিবারের সাথে হোক কিংবা সাহাবিদের সাথে।

হ্যাঁ, তিনি রাগান্বিত হয়েছেন। কিন্তু তা কখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। সাহাবিরা নবিজির চেহারা দেখেই বুঝতে পারতেন, তিনি রাগ করেছেন। তবে কখনোই তিনি কোনো কাজের মধ্যে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন না। আমাদের

---

[৬৫] সহিহ বুখারি : ৬১১৬

[৬৬] সহিহ বুখারি : ৬১১৪; সহিহ মুসলিম : ৬৫৩৫

মধ্যে অনেকেই এমন আছে, যারা কিনা রাগান্বিত হলে মোবাইল ছুড়ে মারে, প্লেট-গ্লাস ভেঙে ফেলে। কিন্তু নবিজি এমনটা করতেন না।

একবার এক সাহাবি বুঝতে পারেন, নবিজি তাঁর ওপর রাগ করেছেন। তিনি দেখতে পান, রাসূলুল্লাহ হাসির মাধ্যমে তাঁর রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। নবিজি হাসছেন ঠিকই, কিন্তু সেই হাসি ছিল রাগমিশ্রিত।

এখন আপনি ভাবতে পারেন, আমি বদমেজাজি। আমার রাগ হলে আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমারই-বা কী করার আছে! হ্যাঁ এটা ঠিক, প্রতিজন মানুষই আলাদা আলাদা মেজাজের অধিকারী। আমরা আবু বকর ও উমর (রা.)-এর দিকে তাকালেই দেখি—দুজন ছিলেন দুই প্রকৃতির মানুষ। একজন ঠান্ডা। আর অন্যজন ছিলেন গরম মেজাজের।

তারপরও মাঝেমধ্যে আবু বকর (রা.)-কে প্রচণ্ড রাগান্বিত হতে দেখা যেত। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি উমর (রা.)-এর চেয়েও বেশি রাগান্বিত ছিলেন। অন্যদিকে খলিফা হওয়ার পূর্বের উমর এবং পরের উমর ছিলেন একেবারেই ব্যতিক্রম। খলিফা হওয়ার পর তিনি আগের মতো কঠোর ছিলেন না। তখন থেকে তিনি তাঁর রাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন।

যারা বলে—আমি গরম মেজাজের, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, তাদের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর দৃষ্টান্তই উল্লেখ্য। যারা স্বভাবতই ঠান্ডা মেজাজের, আর যারা ত্যাগ-সাধনার পর এ গুণের অধিকারী হয়েছেন, দুজনের সওয়াব কিন্তু সমান হবে না। যিনি নিজের একান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনি বেশি সওয়াব পাবেন। তার নেকের পাল্লা ভারি হবে।

এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমরা কীভাবে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি?

দুআ করা

দুজন সাহাবি নবিজির সামনে রাগান্বিত হলেন। একপর্যায়ে তারা একজন আরেকজনকে কটু কথা বলতে লাগলেন। রাগের আতিশয্যে একজনের চেহারা তো টগবগে লালই হয়ে গিয়েছিল, চেহারার রগগুলো ফুলে উঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন—আমি এমন একটা দুআ জানি, যেটা পড়লে রাগ দূর হয়ে যাবে। উপস্থিত সাহাবিরা জানতে চাইল, দুআটি কী? উত্তরে নবিজি বললেন, আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বয়ান।[৬৭]

---

[৬৭] সহিহ বুখারি : ৩২৮২

এটা হলো রাগ কমানোর দুআ। কেউ যদি রাগান্বিত অবস্থায় দুআটি পড়ে, আল্লাহ তার রাগ কমিয়ে দেবেন।

এই রাগের কারণে অনেক সম্পর্ক নষ্ট হয়, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, চাচা-ভাতিজার মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দেয়। তাই আমরা যদি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

অজু করা

নবিজি বলেন, রাগ আসে শয়তান থেকে। শয়তানকে আগুন থেকে তৈরি করা হয়েছে। অতএব, তোমাদের কারও রাগ হলে সে যেন অজু করে নেয়।[৬৮]

কাজ কমিয়ে দেওয়া

নবিজি বলেন, তোমাদের কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হয়, সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ কমে, তাহলে তো ভালো; অন্যথায় সে যেন শুয়ে পড়ে।[৬৯]

নীরবতা অবলম্বন

নবিজি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে, সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে।[৭০]

সুন্নাহর আলোকে রাগ নিয়ন্ত্রণের এই চারটি পদ্ধতি পাওয়া যায়। সাইকোলজিস্টরা এর সঙ্গে যুক্ত করে আরেকটি পদ্ধতির কথা বলেন। সেটা হলো, কোন কাজটির ফলে আপনি রেগে যান, তা চিহ্নিত ও উপলব্ধি করা। অতঃপর ওই কাজটি করা থেকে বিরত থাকা। অভ্যাস থাকলে এর বিপরীতে অভ্যস্ত হওয়া। তাতেও নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মনে করুন, ফেসবুকে কারও লেখা পড়লে আপনার রাগ ওঠে। যতবার তার লেখা চোখের সামনে আসে, ততবার আপনি রাগে ফোঁস ফোঁস করেন। এক্ষেত্রে আপনার কাজ হলো সেই ব্যক্তিকে 'আনফলো' করা। আপনি রাগান্বিত হলে কিছুক্ষণ কথা বলা বা কারও ম্যাসেজের উত্তর দেওয়া বন্ধ রাখুন। মন শান্ত হলে রাগ কমবে। আর তখন কথা বলুন কিংবা ফেসবুকে কমেন্ট-ম্যাসেজের উত্তর দিন।

রাগ আমাদের শারীরিক সমস্যারও কারণ বটে। যেমন : উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ হলো রাগ। কেউ আপনাকে কিছু বলতে থাকলে তার মুখ বন্ধ

---

[৬৮] সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৮৪

[৬৯] সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৮২

[৭০] ইমাম বুখারি, *আদাবুল মুফরাদ* : ২৪৪

করতে পারবেন না। কিন্তু তার ওপর রাগ করবেন নাকি ক্ষমা করে দেবেন, সেটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আপনার কাছে।

সাইকোলজিস্টরা বলেন, বেশির ভাগ রাগের অন্যতম কারণ হলো আমাদের ইগো। আপনি রাগ করেন কেন? কারণ, আপনি মনে করেন—আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে এমন কোনো কথা বলা কিংবা কোনো কাজ করা হয়েছে। আপনি যদি নিজেকে ছোটো করে দেখেন, বিনয়ী হন, উদারতা দেখান; দেখবেন রাগ করার মতো অসংখ্য কারণ কমে আসবে। তখন নিজেকে সংযত রাখতে পারবেন।

একবার এক ভরা মজলিসে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি শাফেয়ি? ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলে লোকটি বলে উঠল, তুমি একজন নিকৃষ্ট পাপী। ইমাম শাফেয়ি তৎক্ষণাৎ দুআ করলেন, ইয়া আল্লাহ! লোকটি যা বলল তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন। আর যা বলল তা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে মিথ্যে বলার জন্য তাকেও ক্ষমা করুন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যদি কোনো মানুষকে যাচাই করতে হয়, সে যখন শান্ত থাকে তখন যাচাই করো না; বরং সে যখন রাগান্বিত হয়, তখন তাকে যাচাই করো।

একজন রাগান্বিত মানুষের আচরণই বলে দেয়—সে কেমন মানুষ, তার মধ্যে নীতি-নৈতিকতাবোধ কেমন। ঠান্ডা মাথায় আপনি নীতি-নৈতিকতা, আদব-আখলাক শিখলেন। কিন্তু এগুলো যখন প্রয়োগ করার সময় আসে, তখন যদি আপনি উত্তেজিত হয়ে অনৈতিক কাজ করে ফেলেন, বেয়াদবিমূলক কাজ করেন, তাহলে মুখস্থ নীতি-নৈতিকতা শিখে আপনার কোনোই লাভ হলো না!

আমানতদারিতা

একজন মুসলিমকে অবশ্যই আমানতদার হতে হবে। সে নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলবে, মানুষজন যেন তাকে বিশ্বাস করে। হয়ে উঠবে সকলের বিশ্বাসের পাত্র। তা ছাড়া একজন মুসলিম হয়ে সে তো কোনোভাবেই কারও সাথে প্রতারণা করতে পারে না।

বিশ্বস্ততার আরবি শব্দ হলো 'আমানাহ'। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে শক্তিশালী একটি আয়াত নাজিল করেন। তিনি বলেন—

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে।'[৭১]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনুনে মুমিনের ১৫টি গুণের কথা উল্লেখ করেন। সেইসব গুণের মধ্যে একটি হলো আমানত রক্ষা। তিনি বলেন—

> 'এবং যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান।'[৭২]

সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন—

> 'হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।'[৭৩]

আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে সম্মানিত ফেরেশতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাইল) এটা নিয়ে অবতরণ করেছে।'[৭৪]

জিবরাইল (আ.)-কে আল্লাহ কুরআনে 'রুহুল আমিন' বিশ্বস্ত আত্মা/ফেরেশতা বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও প্রশংসা করার জন্য অনেকগুলো বিশেষণ ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর জন্য বেছে নেন বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতার গুণ।

---

[৭১] সূরা নিসা : ৫৮
[৭২] সূরা মুমিনুন : ৮
[৭৩] সূরা মায়েদা : ১
[৭৪] সূরা শুআরা : ১৯৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্ব থেকেই মক্কার লোকজন তাঁকে আল আমিন বলে ডাকত। আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার এই গুণের প্রশংসা করেন, এখনও উম্মাহ হিসেবে আমরা এই গুণের প্রশংসা করি।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, নবিজি এমন খুতবা খুব কম দিতেন, যেসব খুতবায় তিনি এই কথাটি বলতেন না—যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই।[৭৫]

আপনি নিজেকে মুসলিম দাবি করেন, কিন্তু আমানত রক্ষা করেন না, তাহলে বোঝা গেল আপনার মধ্যে ঈমান নেই। ঈমান থাকলে আপনি আমানত রক্ষা করতেন। ঈমান থাকার মানে হলো, আপনি আল্লাহকে ভয় পান। আর জানেন, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। ফলে কখনোই আপনি মানুষকে ঠকাতে পারবেন না, আমানতের খেয়ানত করতে পারবেন না। আমানতের গুণ এত প্রশংসিত, যদি এই গুণ অমুসলিমদের মাঝেও পাওয়া যায়, আল্লাহ তার প্রশংসা করেন। পবিত্র কুরআনে কতিপয় ইহুদি ও খ্রিষ্টানের এই গুণের প্রশংসা করে তিনি বলেন—

> 'আর কিতাবিদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যদি তার নিকট তুমি অঢেল সম্পদ আমানত রাখো, তবুও সে তোমার কাছে ফেরত দেবে।'[৭৬]

আমানতের অনুপস্থিতিকে খেয়ানত বলে। নবিজি মুনাফিকের চারটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি লক্ষণ হলো, যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে তা খেয়ানত করে।[৭৭] আমানতের রক্ষা করা প্রকৃত ঈমানের পরিচয়, আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের পরিচয়। আমানতের আবার কিছু ধরন রয়েছে । যেমন—

দ্বীনের আমানত

দ্বীনের আমানত হলো আল্লাহর ইবাদত করা, নামাজ পড়া, জাকাত আদায় করা, রোজা রাখা ইত্যাদি। এই ধরনের আমানতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'নিশ্চয়ই আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে।'[৭৮]

---

[৭৫] মুসনাদে আহমাদ : ১১৯৩৫

[৭৬] সূরা আলে ইমরান : ৭৫

[৭৭] সহিহ বুখারি : ৩৪

[৭৮] সূরা আহজাব : ৭২

দায়িত্বের আমানত

যখন আপনাকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়, অবশ্যই সেটি একটি আমানত। এর দায়িত্ব ঠিকমতো পালনের মাধ্যমে আপনি আমানত রক্ষা করতে পারেন। যত বড়ো দায়িত্ব, আমানতও তত বেশি। ফলে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রশংসা করা হয়। কারণ, তিনি তার আমানতগুলো যথাযথভাবে রক্ষা করেন।

আপনি যদি চাকরি করেন, সেখানে আপনার বিভিন্ন দায়িত্ব থাকবে। এইসব দায়িত্ব আপনাকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। চাকরিটা কোনো কারণে আপনার কাছে অপছন্দনীয় হলে সেটা ছেড়ে দিতে পারেন। তাই বলে ইচ্ছে করে আপনি ফাঁকিবাজি করতে পারেন না, আমানতের খেয়ানত করতে পারেন না।

আর্থিক আমানত

কেউ যদি আপনার কাছে টাকা জমা রাখে, সেটা আপনার কাছে আমানত। ব্যাংকব্যবস্থার পূর্বে মানুষ মানুষের কাছে টাকা জমা রাখত। কোথাও সফর করার পূর্বে সমস্ত টাকা বা সম্পদ তারা যাকে বিশ্বাস করত, তার কাছে আমানত রাখত।

আপনি কারও কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করলে সময়মতো সেই ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া আপনার দায়িত্ব। যদি ঋণ গ্রহণের কথা অস্বীকার করেন, ঋণ ফিরিয়ে না দেন, তাহলে আপনি আমানতের খেয়ানত করলেন।

জিহ্বার আমানত

আপনি যখন কাউকে কোনো কথা দেবেন, সেই কথা রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব; এটাও একপ্রকার আমানত।

কথার আমানত

কেউ যদি আমাদের কোনো কথা বলার পর সেটা গোপন করতে বলে, তাহলে সেটাও একধরনের আমানত। যদি তার গোপন কথাটি কাউকে বলে দিই, তাহলে আমানতের খেয়ানত হবে।

নবিজি বলেন, সকল মজলিস আমানতস্বরূপ।[৭৯] আমরা একসাথে অনেকজন বসি, আড্ডা দিই। সেখানে নানান কথা-কারবার নিয়েই আলোচনা হয়। ওসব আলোচনার কিছু কিছু অংশ আবার অনেকেই ফেসবুকে পোস্ট আকারে লিখতে চায়। তখন লেখার পূর্বে ভেবে নিন কিংবা যার আলোচনার অংশবিশেষ পোস্ট করার কথা

---

[৭৯] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৬৯

ভাবছেন, তাকে জিজ্ঞেস করে নিন। নবিজি বলেন, কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলার পর মুখ ঘোরালে (কেউ শুনছে কিনা তা পুনরায় পরখ করলে) তা আমানতস্বরূপ।[৮০]

কেউ কোনো কথা বলার পর 'কথাটি গোপন রাখবেন' বলতে হবে কেন? আপনাকে সে বিশ্বাস করেই তো কথাটি বলেছে, সতর্ক করুক বা না করুন। কথার ধরন দেখেই যদি বোঝেন, এটি গোপন কথা; তাহলে অবশ্যই আপনি তা গোপন রাখুন।

মনে করুন, এক মজলিসে একজন আরেকজনের গিবত করল। সে কিন্তু গিবত করে গুনাহ কামিয়েছে। এখন যদি আপনি ওই গিবতের কথা, যাকে নিয়ে গিবত করা হয়েছে তার কানে পৌঁছে দেন, তখন সেটাও গুনাহের কাজ। একে বলা হয় 'নামিমাহ'। গিবত যেমন হারাম, তা অন্যজনকে জানানোও হারাম।

পরামর্শের ক্ষেত্রে আমানত

কেউ যদি আপনার কাছে পরামর্শ চায়, সেটাও একধরনের আমানত। যেমন, কেউ একজন এসে ব্যাবসার কিছু পরিকল্পনা আপনাকে জানাল। ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি তাকে কিছু পরামর্শ দিলেন। অতঃপর আরেকজন ব্যবসায়ীকে যদি প্রথমজনের পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেন, সেটা হবে আমানতের খেয়ানত।

হাফসা বিনতে উমর (রা.) বিধবা হওয়ার পর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর জন্য পাত্র খোঁজেন। তিনি আবু বকর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে যান। কিন্তু দুজনের একজনও তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেননি। বন্ধুপ্রতীম দুজনই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি খুব ব্যথিত হন। অতঃপর নবিজি হাফসা (রা.)-কে বিয়ে করেন।

রাসূলুল্লাহর বিয়ের পর আবু বকর (রা.) তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণ জানান। তিনি বলেন, আপনার প্রস্তাব গ্রহণ না করায় আমার ওপর ব্যথিত হয়েছেন। আপনি যখন প্রস্তাব দেন, একটি কারণে তা প্রত্যাখ্যান করি। কারণ, আমি নবিজিকে তাঁর (হাফসা) সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তা ছাড়া নবিজির গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনি। যদি তিনি তাঁকে বাদ দিতেন, তবে আমি তাঁকে বিয়ে করতাম।[৮১]

আবু বকর (রা.) রাসূলের সেই গোপন কথা সম্পর্কে এত সচেতন ছিলেন, তিনি তা তাঁর প্রিয় বন্ধু উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কেও বলেননি।

---

[৮০] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৬৮

[৮১] সুনানে নাসায়ি : ৩২৪৮

নবিজির খাদেম হওয়ার কারণে আনাস ইবনে মালেক (রা.) রাসূলের অনেক গোপন বিষয় সম্পর্কে জানতেন। কখনো-বা নবিজি নিজেই তাঁকে বলতেন। একবার নবিজি আনাস (রা.)-কে একটি গোপন কথা বলেন। ছোট্ট বয়সেও তাঁর মধ্যে আমানতদারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। নবিজির এই গোপন বিষয় সম্পর্কে তাঁর জন্মদাত্রী মা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু আমানতের খেয়ানত হবে বিধায় তিনি নিজের আপন মাকেও সেই কথাটি বলেননি।[৮২]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আমানত

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আমানতের খেয়ানত হলো সবচেয়ে নিকৃষ্টতম আমানতের খেয়ানত। নবিজি বলেন, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ের, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়![৮৩]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একান্ত গোপনীয় বিষয়গুলো হলো আমানত। সেই আমানত বন্ধু-বান্ধবী বা অন্য কারও সাথে শেয়ার করা যাবে না। যদি তারা নিজেদের একান্ত গোপনীয় ব্যাপারগুলো অন্যের সাথে শেয়ার করে, সেটা হবে সর্বনিকৃষ্ট পর্যায়ের আমানতের খেয়ানত।

তবে হ্যাঁ, প্রয়োজনে কিছু কথা বলা যেতে পারে। যেমন : ডাক্তারের কাছে যাওয়া বা পরামর্শ নেওয়া। তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টানাপোড়েন হলে তা মিটমাটের জন্য তৃতীয় পক্ষের পরামর্শ নেওয়া যেতেই পারে। এইসব ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু সাধারণ নিয়ম হলো, গোপনীয়তা প্রকাশ করা যাবে না।

আমানত আর ঈমান অনেকটা পাশাপাশি। ঈমান ও আমানত একই ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে। আমানত এমন একটা ব্যাপার, যা আপনি কাউকে কিছু বলে স্বস্তি লাভ করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি কারও নামাজ আর রোজা দেখে তাকে যাচাই-বাছাই করি না। কাউকে যাচাই করি তার আমানতদারিতা দেখে; নামাজ-রোজা তো সবাই করে।

আমানতদারিতার গুণ অর্জন করতে বছরের পর বছর লেগে যায়। কিন্তু এই গুণ ভাঙতে ছোট্ট একটি ভুলই যথেষ্ট। এজন্য আমাদের অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

---

[৮২] সহিহ বুখারি : ৬২৮৯

[৮৩] সহিহ মুসলিম : ৩৪৩৪

ভালো কাজে অন্যকে সহযোগিতা

একজন মুমিন বিচ্ছিন্নবাদী নয়, সে সন্ন্যাসী জীবনযাপন করতে পারে না। মুমিনকে অবশ্যই সমাজে বসবাস করতে হয়। বৃহত্তর স্বার্থে একজন মুমিন আরেকজন মুমিনকে সহযোগিতা করে। কেউ যদি মনে করে, সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদত করলে মনে হয় সহজে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যাবে, তাহলে এটা ভুল ধারণা। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চাইলে সমাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হবে। থাকতে হবে জামাতের সাথে। কুরআনে আল্লাহ সূরা আসরে তিন শ্রেণির মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা হলো—

> 'যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।'[৮৪]

উদ্ধৃত আয়াতটির প্রথম দুই আমল হলো ব্যক্তিগত আমল, শেষের আমলটি সামষ্টিক আমল। সেটা আপনি একা করতে পারবেন না। সবার সাথে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করলে তবেই আপনি অন্যকে সত্যের উপদেশ দিতে পারেন, ধৈর্যের দাওয়াত দিতে পারেন।

আপনি অন্যকে সহযোগিতা করতে হলে একসাথে বসবাস করতে হবে। প্রত্যেক নবি-রাসূলগণ সমাজে বসবাস করেছেন। তাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন সমাজ গঠন করতে, আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে। কেউই সমাজ ছেড়ে গুহায় বসবাস করতে মানুষকে নির্দেশ দেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে পাওয়া যায়, তিনি মক্কা ও মদিনায় বিশাল একটা সমাজ গড়ে তোলেন। ইন্তেকালের পূর্বে ওই দুই সমাজেই তিনি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়েছ।'[৮৫]

---

[৮৪] সূরা আসর : ৩

[৮৫] সূরা আলে ইমরান : ১০৩

সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, তারা প্রথমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলেন। আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে তারা পরস্পর ভাই ভাই হতে পেরেছিলেন। নবিজি মুমিনের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের জন্য বিল্ডিংয়ের ইটের মতো, যার এক অংশ আরেক অংশকে শক্তিশালী করে থাকে।[৮৬]

এই কথা বলে নবিজি তাঁর হাতের আঙুলগুলো একটি আরেকটির সাথে মিলিয়ে ওপরে ওপরে রাখলেন, বিল্ডিং নির্মাণের সময় যেমন একটি ইটের ওপর আরেকটি ইট রাখা হয়। আপনি একটি ইট দিয়ে একটি বিল্ডিং নির্মাণ করতে পারবেন না। এর জন্য অনেকগুলো ইটের প্রয়োজন। সবগুলো ইট পরস্পর জোড়া লাগালে তবেই বিল্ডিং নির্মাণ করতে পারবেন। মুমিনের উদাহরণও তেমন। একটি ভালো কাজ করতে গেলে সবাইকে একত্রিত হতে হবে। নিজ নিজ জায়গা থেকে আলাদা আলাদা অবস্থান করে বড়ো ধরনের কোনো ভালো কাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

'তোমরা সৎকাজ ও দ্বীনদারিতায় একে অন্যের সাহায্য করো।'[৮৭]

ইসলাম কোনো ব্যক্তিগত ধর্মের নাম নয়। সামষ্টিক ও সামাজিক ধর্মই মূলত ইসলাম। আপনি যদি মনে করেন একাকী নামাজ-রোজা করে দ্বীনদার হয়ে যাবেন, এটা ভুল ধারণা। আপনাকে জামাতের সাথে থাকতে হবে। নবিজি বলেন, আল্লাহর রহমতের হাত মুসলিমদের জামাতের ওপর থাকবে। আর যে ব্যক্তি জামাত থেকে পৃথক হয়ে যায়, শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায় এবং তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়।[৮৮]

আমরা মুসলিম জামাতের সাথে বসবাস করব; আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য কখনোই জামাত বিচ্ছিন্ন থাকার প্রতি উৎসাহিত করে না। জামাত বিচ্ছিন্ন হলে ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে নবিজি একটি উদাহরণের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। পালের যে মেষটি দল থেকে আলাদা হয়ে যায় কিংবা যেটি খাবারের সন্ধানে দূরে সরে পড়ে বা যেটি অলস বলে এক কিনারায় বসে থাকে, নেকড়ে সেটিকে শিকার করে নেয়। তোমরা কখনো জামাত ছেড়ে গিরিপথে চলে যাবে না, জামাতবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের সাথে থাকবে।[৮৯]

আমরা মুসলিম জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমাদের ঈমানে ঘাটতি দেখা দেয়। ঈমানে ঘাটতি দেখা দেয় আমাদের সন্তানদের। আপনার সন্তানকে আপনি

---

[৮৬] সহিহ বুখারি : ৪৮১

[৮৭] সূরা মায়েদা : ২

[৮৮] সুনানে নাসায়ি : ৪০২০

[৮৯] মুসনাদে আহমাদ : ২১৬০২

মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করুন। মসজিদে নিয়ে যান। ওই পরিবেশের সাথে, মুসলিম জামাতের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিন।

জামাত মানে কেবল মসজিদে নামাজের জামাত মনে করলে হবে না। ভালো কাজের জন্য যখন একত্রিত হবেন, সেটাও জামাত। যেমন : গরিব-অসহায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে একত্রিত হলেন। আবার দেশের যেকোনো সংকটের সময় মিসকিনদের সহযোগিতা করতে জামাতবদ্ধ হলেন। এটাও জামাতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, মুমিনরা বৃহত্তর স্বার্থে একত্রিত হলে সেটাও আল্লাহর সুন্নাহ, নতুবা বৃহত্তর স্বার্থ বলতে কিছু থাকত না।

মুসলিম ইতিহাসে এমন কোনো আলিম নেই এবং এমন কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, যিনি কিনা একাকী বা গুহায় বসবাস করে জীবন কাটিয়েছেন। অবশ্যই আপনাকে সমাজে বসবাস করতে হবে, সমাজের মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে।

আপনি কোনো একটি কাজ পছন্দ করেন, সেই কাজটি করতে চান। যারা ওই কাজে দক্ষ তাদের পরামর্শ নিন, তাদের জামাতে শরিক হোন। আমরা যখন কোনো কাজের নিয়তে একত্র হই, আমাদের শক্তি বেড়ে যায়। আমি হয়তো একটি কাজে দক্ষ, আরেকটি কাজে অদক্ষ। কিন্তু আমার সহযোগি হয়তো ওই কাজটাই খুব ভালোভাবে পারে।

একজন ভালো লিখতে পারে, আরেকজন ভালো ডিজাইন করতে পারে। দুজন একত্রিত হলে ভালো ডিজাইনের সাথে একটি ভালো লেখা প্রকাশিত হবে।

আপনি যখন মানুষের সাথে মেশা শুরু করবেন, কেউ না কেউ আপনাকে কষ্ট দেবে। কটু কথাও শোনা লাগতে পারে। তার মানে এই না, আপনি মানুষের সাথে মেশা বন্ধ করে দেবেন। নবিজি বলেন, যে মুমিন মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে, সে এমন মুমিন ব্যক্তির তুলনায় অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়, যে কিনা মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করে না।[৯০]

মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে মানুষের পক্ষ থেকে আপনার কাছে কষ্ট আসবেই, তাতে ধৈর্যধারণ করলে অবশ্যই সওয়াব পাবেন। আপনি ঘরে একা একা নির্জনে নিরিবিলি থাকার আর কোনো সুযোগ থাকল না। আপনাকে বের হয়ে আসতে হবে। মানুষের সাথে মিশতে হবে। কথা বলতে হবে। বিপদে অপরের পাশে দাঁড়াতে এবং ভালো কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

---

[৯০] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০৩২

অন্যের দোষ গোপন রাখা

মুমিনের অন্যতম একটি গুণ হলো, সে অন্যের দোষ গোপন রাখে। একজন মুমিন অন্যের দোষত্রুটি কারও কাছে বলে বেড়ায় না। নাটকীয়তার আশ্রয় নেয় না। আরবিতে একে বলা হয় 'সিতির'। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

> 'নিশ্চয়ই যারা এটা পছন্দ করে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।'[৯১]

আল্লাহ আরও বলেন—

> 'মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কারও ওপর জুলুম করা হলে সেটা ভিন্ন কথা।'[৯২]

আল্লাহ কখনোই মন্দ কথা এবং মন্দ কাজ পছন্দ করেন না। আর এর প্রচারণা ছড়িয়ে পড়ুক তা-ও তিনি চান না। তবে কারও ওপর জুলুম করা হলে বিচারের জন্য একাধিকজনকে জানানো যেতে পারে। যেমন : কাউকে যদি নিয়মিত চুরি করতে দেখেন, অন্যের অধিকার হরণ করতে দেখেন, তখন সেটা জনসম্মুখে বলতে অসুবিধা নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এ রকম অসংখ্য ঘটনা দেখা যায়। তন্মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হলো আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে অপবাদের (ইফকের) ঘটনা। যারা গুজব রটিয়েছিল, তাদের ব্যাপারে যেমন আল্লাহ শাস্তির কথা উল্লেখ করেন, তেমনই বাকিদের ব্যাপারে বলেন—

> 'এ কথা শোনার পর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করেনি এবং বলেনি—এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ?'[৯৩]

আল্লাহ দোষত্রুটি গোপন করতে পছন্দ করেন। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হলো, আস-সিত্তির। এর অর্থ, যিনি দোষত্রুটি গোপন রাখেন।

---

[৯১] সূরা নুর : ১৯
[৯২] সূরা নিসা : ১৪৮
[৯৩] সূরা নুর : ১২

নবিজি বলেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল, গোপনীয়তা অবলম্বনকারী। তিনি লজ্জা ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন।[৯৪]

নবিজির একজন সাহাবি ছিলেন। নাম ছিল মাইজ আসলামি (রা.)। তিনি একবার যিনা করে ফেলেন। এরপর তিনি অনুতপ্ত হন, শাস্তি পেতে চান। পরামর্শের জন্য যান আবু বকর (রা.)-এর কাছে। আবু বকর (রা.) বলেন—আল্লাহ তোমার পাপ গোপন রেখেছেন, এখন তুমি নিজে তোমার পাপ গোপন রাখো।

অতঃপর তিনি যান তাঁর বন্ধু হাজ্জাল (রা.)-এর কাছে। হাজ্জাল (রা.) মাইজ আসলামিকে নিয়ে যান নবিজির কাছে। মাইজ নিজের পাপের কথা কয়েকবার রাসূলুল্লাহর কাছে বলেন, তিনি তাঁকে যিনার শাস্তি দেন। শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তিনি মাইজকে দোষারোপ না করে বরং হাজ্জালকে দোষারোপ করেন। কারণ, হাজ্জাল চাইলে মাইজ (রা.)-এর পাপ গোপন রাখতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ বলেন, হে হাজ্জাল! যদি তুমি এই খবরটি গোপন রাখতে, তাহলে তা তোমার জন্য ভালো হতো।[৯৫]

নবিজি হাজ্জাল (রা.)-সহ অন্য সাহাবিদের শেখালেন—তোমরা কেউ যদি কারও বড়ো কোনো পাপ গোপন রাখো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের পাপ গোপন রাখবেন। কারও পাপ বলে বেড়ানোর চেয়ে সেটা গোপন রাখাটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। নবিজি বলেন—কোনো বান্দা যদি অপর কোনো বান্দার দোষক্রটি দুনিয়াতে গোপন রাখে, আল্লাহ তার দোষক্রটি কিয়ামতের দিন গোপন রাখবেন।[৯৬]

আপনি জানতে পারলেন, আপনার কোনো মুসলিম ভাই বা বোন একটা পাপ করে ফেলেছে। আর সেটা গোপনে এসে সে আপনার কাছে শেয়ার করেছে কিংবা আপনি তাকে ওই কাজটা করতে দেখেছেন। এমনটি হলে তার দোষ গোপন রাখুন। আপনি যদি তার সেই দোষ বা পাপ কর্মটি গোপন রাখেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ যদি আপনার দোষ গোপন রাখেন, আপনার স্থান হবে জান্নাতে।

মুনাফিকের কাজ হলো অন্যের দোষক্রটি খোঁজা এবং তা বলে বেড়ানো। কাউকে কোনো পাপ করতে দেখলে তারা সেটাকে ক্যামেরাবন্দি করে। পুরো দুনিয়াকে সেই পাপ দেখায়। এমন কাজের ব্যাপারে নবিজি সতর্কবার্তা জানিয়ে দেন। তিনি বলেন—হে লোক সকল! যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছ, কিন্তু

---

[৯৪] সুনানে আবু দাউদ : ৪০১২

[৯৫] *মুয়াত্তা ইমাম মালেক* : ১৫০৯; সুনানে আবু দাউদ : ৪৩৭৭

[৯৬] সহিহ মুসলিম : ৬৪৮৯

অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গিবত করবে না এবং তাদের দোষক্রটি তালাশ করবে না। কেননা, যারা দোষক্রটি খুঁজে বেড়াবে, আল্লাহও তাদের দোষক্রটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারও দোষক্রটি খুঁজলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন।'[৯৭]

এই হাদিসটি খুবই ভীতিপ্রদর্শনকারী হাদিস। যারা সারাক্ষণ অন্যের দোষক্রটি খুঁজে বেড়ায়, রাসূলুল্লাহ তাদের মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, তারা মুখে ঈমান আনলেও তাদের অন্তর ঈমান আনেনি।

এখনকার সময়ে আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন ও টিভি চ্যানেল সারাক্ষণ অন্যের দোষক্রটি নিয়ে সমালোচনা করছে। কোন সেলিব্রিটি কখন কী করেছে, সেটাই যেন তাদের নৈমিত্তিক আলোচনার বিষয়। মিডিয়ার দ্বারা প্রভাবিত এমন কাজ আমাদের মুসলিম সমাজকেও আক্রান্ত করেছে। ফলে মুসলিমরা তাদের মূল বৈশিষ্ট্য ভুলে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দোষক্রটি খোঁজায় লিপ্ত।

প্রত্যেকেই আমরা জীবনে কোনো না কোনো পাপ করেছি। ভুল করেছি। আবার কাউকে কাউকে পাপ করতে দেখেছি। এক্ষেত্রে ইসলাম আমাদের বলে, নিজেদের গোপন পাপ যেন আমরা গোপন রাখি এবং অন্যের গোপন পাপও যেন গোপন রাখি। কাউকে পাপকর্মে লিপ্ত থাকতে দেখলে অন্যকে বলার আগে তাকে বলতে পারি—ভাই, আপনি যেটা করছেন, এটা তো পাপ। আল্লাহর ওয়াস্তে ফিরে আসুন এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করুন।

কিন্তু সাধারণ নিয়ম হলো পাপকে গোপন রাখা। আমাদের এই সময়ে যেটা অনুপস্থিত। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—যদি আমরা অন্যের দোষ বলে বেড়াই, এতে কী এমন ক্ষতি হয়? হ্যাঁ ক্ষতি হয়, কিছু ব্যাপার নিয়ে তাহলে আলোচনা করা যাক :

পাপীর তাওবা করা কঠিন হয়

আপনি যদি কারও গোপন পাপ প্রকাশ করে দেন—যে পাপ করেছে, তাকে নিয়ে সবাই হাসি-তামাশা করে। তার ব্যাপারে কথা এ কান ও কান করে। অথচ খোঁজ করলে দেখা যাবে, অন্যরাও গোপনে এই ধরনের পাপ করে। যখন একমাত্র তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়, মনে হয় বাকিরা নিষ্পাপ। তা ছাড়া এখানে তার পাপ প্রকাশিত হয়েছে, বাকিদেরটা হয়নি। ফলে সবার হাসি-তামাশা, কটু কথা তীব্রভাবে আত্মসম্মানে আঘাত করে। সে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে পারে না, সংকোচবোধ করে। আর এটাকে ব্যক্তিগত আঘাত হিসেবে নেয়।

---

[৯৭] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৮০

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) বলেন—আল্লাহ যদি আমাদের পাপগুলো গোপন না রাখতেন, তাহলে আমরা একসাথে বসতে পারতাম না।

আমরা গোপনে যেসব পাপ করেছি, সবাই যদি তা জেনে যেত, তাহলে কি একসাথে বসতে পারতাম, দেখা হলে কুশল বিনিময় করতে পারতাম? কখনোই না! আল্লাহ যেহেতু আমাদের পাপসমূহ গোপন রেখেছেন, আমরা কেন অন্যের পাপ গোপন রাখব না?

নিজের অহংকার বাড়ে

অন্যের পাপের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে কিছু সময়ের জন্য নিজেকে নিষ্পাপ ধরে নেবেন। আপনার মনে হবে—ওই লোকটি তো বদ, খারাপ, পাপী। দেখা যাবে, এসব পাপ আপনি নিজেও করেন। কিন্তু অন্যের পাপ দেখে অতি উৎসাহিত হয়ে তা প্রচার করছেন, আর নিজেরটা গোপন রাখতে চাচ্ছেন।

পাপের কথা প্রচার হলে সেটা স্বাভাবিক হয়

আপনি যখন পাপের কথা নিঃসংকোচে প্রচার করতে থাকবেন, তখন সমাজে পাপাচার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। একসময় পাপকে আর পাপ মনে হবে না। আমরা যদি বলতে থাকি—অমুক মদ খায়, তমুক মদ খায়। অমুকের গার্লফ্রেন্ড আছে, তমুকের বয়ফ্রেন্ড আছে। দেখা যাবে ১০-১৫% পাপে লিপ্ত। কিন্তু তাদের পাপের কথা জেনে বাকিরাও এই ধরনের পাপের প্রতি উৎসাহিত হবে। তারা ভাববে—অমুকে করে, আমি করলে অসুবিধা কী?

ছুড়ে ফেলার সংস্কৃতি তৈরি

কারও কোনো গোপন পাপের কথা প্রকাশিত হলে দেখা যায় তাকে সামাজিক নানান কাজ থেকে ছুড়ে ফেলা হয়। তার যত ভালো কাজ আছে, সবগুলো খারিজ করে দেওয়া হয়। অথচ মানুষমাত্রই ভালো-মন্দের মিশেল। এমন কেউ নেই—একেবারে ভালো, খাঁটি। আবার এমন কেউও নেই যে একেবারে বদ, মন্দ।

এই প্রসঙ্গে নবিজির উৎসাহ জাগানিয়া একটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তিকে তার রবের নিকটবর্তী করা হবে। তারপর আল্লাহ তাকে পর্দা দিয়ে ঢেকে দেবেন এবং তার পাপের ব্যাপারে তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। জানতে চাইবেন, তুমি তোমার পাপ সম্পর্কে জানো? সে বলবে, হে আমার রব! আমি জানি। আল্লাহ বলবেন, তোমার এই পাপ দুনিয়াতে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ তোমার এই পাপগুলো আমি মাফ করে দিলাম।[৯৮]

---

[৯৮] সহিহ মুসলিম : ৬৯০৮

হাসিমুখে কথা বলা

সব সময় হাসিখুশি থাকা মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য। একজন মুমিন সারাক্ষণ গম্ভীর মুখে থাকতে পারে না। মাঝেমধ্যে সে হাসবে, আনন্দ করবে। জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) মদিনায় বসবাস করতেন। তিনি বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে তাকাতেন, তিনি মুচকি হাসতেন।[৯৯]

জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার মসজিদে নববিতে নামাজ পড়তে যেতেন। দিনের অন্যান্য সময়েও রাসূলুল্লাহর সাথে তাঁর দেখা হতো। তিনি বলেন—নবিজি যখনই তাঁর দিকে তাকাতেন, হাসিমুখে তাকাতেন। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা.) নামে আরেকজন সাহাবি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর চাইতে বেশি মুচকি হাসি দিতে আর কাউকে দেখিনি।[১০০]

নবিজি নিজে যেমন হাসিখুশি থাকতেন, তেমনই আমাদেরও হাসিখুশি থাকার উপদেশ দেন। অন্যের সাথে হাসিমুখে কথা বলাকে যেন তুচ্ছভাবে না দেখি, সেজন্য তিনি সতর্ক করেন। বলেন, কোনো নেক আমলকে হীন মনে করো না; হোক সেটা ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ।[১০১]

আমরা যদি কারও সাথে হাসিমুখে কথা বলি, তাতেও সওয়াব আছে আর সেটা হলো সাদাকার সওয়াব। নবিজি বলেন, প্রতিটি ভালো কাজই সাদাকারূপে গণ্য। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে দেখাসাক্ষাৎ করাও (সাদাকার অন্তর্ভুক্ত)।[১০২]

আমি একটি বিষয় লক্ষ করেছি। তা হলো, যারা দ্বীনে ফেরে, ফেরার পর আকস্মিকভাবেই তাদের মেজাজ রুক্ষ হয়ে যায়। দিনের অধিকাংশ সময়ই মেজাজ উত্তপ্ত থাকে। মুখে হাসি দেখা যায় না। কেমন যেন রাগান্বিত, ধমকাধমকির মধ্যে থাকে। আমি জানি না তারা কোন সুন্নাহ পালন করে, এমন সুন্নাহ তারা কোথায় পেয়েছে!

---

[৯৯] সহিহ বুখারি : ৩০৩৫

[১০০] জামে আত-তিরমিজি : ৩৬৪১

[১০১] সহিহ মুসলিম : ৬৫৮৪

[১০২] জামে আত-তিরমিজি : ১৯৭০

ইসলাম আমাদের বলে, আমরা যেন সব সময় হাসিখুশি থাকি। অন্যের সাথে হাসিমুখে আনন্দচিত্তে কথা বলি। কোনো ক্ষেত্রে রাগ দেখানো বা ধমক দেওয়ার প্রয়োজন হলে ধমক দেবো, রাগ দেখাব। কিন্তু আমাদের আদর্শিক আচরণ হলো সব সময় সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলা।

সাইকোলজিস্টরা বলেন, হাসিখুশি থাকলে রক্তচাপ কমে যায়। এটি এমন একটি কাজ, যার প্রভাব আপনার পাশেরজনের ওপর পড়বে। অন্যজনও হাসিমুখে থাকবে। আপনি রাগান্বিত অবস্থায় থাকলে আপনার পাশেরজনও অবচেতন মনেই আপনার রাগ দেখে রাগান্বিত হবে। নবিজি মাঝেমধ্যে অট্টহাসি হাসতেন। এমনভাবে হাসতেন, সাহাবিরা তাঁর মাড়ির দাঁত দেখতে পেতেন।[১০৩]

তবে রাসূলুল্লাহ এমনভাবে হাসতেন না, যেভাবে হাসলে খারাপ দেখা যায়। ফজরের নামাজ পড়ে সাহাবিরা মসজিদে বসতেন। কেউ কেউ জাহেলিয়াতের সময়ের গল্প বলতেন, সবাই হাসতেন। নবিজিও ওই মজলিসের হাসিতে অংশগ্রহণ করতেন।

নবিজি প্রায় সময় কৌতুক বলতেন। সাহাবিরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও আমাদের সাথে কৌতুক করছেন? সাহাবিরা অবাক হতেন এই কারণে, নবিজির মতো একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষ কি তাদের সাথে কৌতুক করতে পারেন। জবাবে তিনি বলেন, আমি কৌতুকচ্ছলে কখনো সত্য ছাড়া মিথ্যা বলি না।[১০৪]

নবিজি মজা করতেন বটে, তবে মজাচ্ছলে মিথ্যা বলতেন না। কাউকে হেয় করতেন না, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না। একবার এক বৃদ্ধা নবিজির কাছে এসে অনুরোধ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দুআ করুন, আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন, শুনুন! কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না!

এ কথা শুনে বৃদ্ধা কান্না জুড়ে দেয়। তখন নবিজি জানিয়ে দিলেন, আপনি বৃদ্ধা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবেন না। কারণ, জান্নাতে সবাই কুমারী হয়েই যাবে।[১০৫]

একবার এক সাহাবি এসে নবিজির কাছে একটি উট চান। নবিজি তাকে বলেন, আমি তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চা দিচ্ছি। সাহাবি চাইলেন উট, রাসূলুল্লাহ দিতে চাইলেন উটনীর বাচ্চা! এটা শুনে সাহাবি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

---

[১০৩] মুসনাদে আহমাদ : ৩৫৯৫

[১০৪] মুসনাদে আহমাদ : ৮৭০৮

[১০৫] *শামায়েলে তিরমিজি* : ১৭৯

উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব? এবার তিনি উত্তরে বললেন, প্রত্যেক উটই তো কোনো না কোনো উটের বাচ্চা![১০৬]

জাহির (রা.) নামের একজন বেদুইন ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে নবিজির কাছে হাদিয়া নিয়ে আসতেন। দেখতে তিনি কালো ছিলেন। চলে যাওয়ার সময় নবিজি বলতেন, জাহির আমাদের পল্লিবন্ধু। আর আমরা তাঁর শহুরে বন্ধু!

জাহির একবার বাজারে বেচাকেনা করছিলেন। নবিজি তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরেন। তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। যখন বুঝতে পারলেন তাঁকে পেছন থেকে আর কেউ নন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাপটে ধরেছেন, তখন নিজের পিট রাসূলুল্লাহর বুকের সাথে মেলালেন।

নবিজি বাজারে হাঁক দিলেন, আমার এই গোলামটিকে কে কিনবে? জাহির (রা.) মন খারাপ করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বিক্রি করলে কেবল অচল মুদ্রাই পাবেন! রাসূলুল্লাহ তাঁর দুঃখ বুঝতে পারলেন। তিনি জাহির (রা.)-এর মনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মানুষ তাঁকে মূল্যায়ন করে না, এটা ঠিক। কিন্তু যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি? নবিজি বললেন, কিন্তু তুমি আল্লাহর নিকট অচল নও। আল্লাহর নিকট তোমার উচ্চমর্যাদা রয়েছে।[১০৭]

নবিজি প্রায়ই সাহাবিদের সাথে মজা করতেন, বিভিন্ন কথা বলে বলে তাঁদের আনন্দিত করতেন। তবে আমাদের কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে :

ক. আমরা যখন কারও সাথে মজা করব, খেয়াল রাখব সে কষ্ট পাচ্ছে কি না। মজাচ্ছলেও এমন কথা বলা যাবে না, যা শুনলে আরেকজন কষ্ট পায়।

খ. মজাচ্ছলে এমন কিছু করা যাবে না, যা দেখে আরেকজন ভয় পায়। যেমন : তেলাপোকা, সাপ-বিচ্ছু দেখিয়ে ভয় দেখানো ইত্যাদি।

নবিজির কয়েকজন সাহাবি একবার একটি সফরে গেলেন। পথমধ্যে একজন সাহাবি ঘুমিয়ে ছিলেন। আরেকজন সাহাবি তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলেন। এটা করেন কেবল মজা করার জন্যই। ঘুমন্ত সাহাবি ঘুম থেকে উঠলে কী ভাববেন? হয়তো এমনটাও ভাবতে পারেন—তাকে কেউ বন্দি করেছে বা গুম করার জন্য তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

---

[১০৬] *শামায়েলে তিরমিজি* : ১৭৭

[১০৭] *শামায়েলে তিরমিজি* : ১৭৮

ঘুমন্ত অবস্থায় বেঁধে ফেলার ফলে তিনি আচমকা ঘুম ভাঙার পর ভয় পেয়ে যান। এই ঘটনাটি নবিজির কানে পৌঁছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, একজন আরেকজনের সাথে মজা করে তো এমনটা করতেই পারেন। একজনকে ভয় দেখিয়ে হলেও তো বাকিরা আনন্দ পেল। কিন্তু না। রাসূলুল্লাহ এই ঘটনাটি শোনার পর কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, কোনো মুসলমানের জন্য আরেক মুসলমানকে ভয় দেখানো বৈধ নয়।[১০৮]

একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো—সে নিজে হাসিখুশি থাকবে, অন্যকে হাসিখুশি রাখবে। সারাক্ষণ রাগত আর ভার মুখো হয়ে বসে থাকলে হবে না। ভালো থাকার জন্য হলেও মাঝেমধ্যে মানুষের সাথে মজা করতে হবে।

সাহাবিরা নবিজির মুখে ইন্তেকালের কয়েক দিন আগেও মুচকি হাসি লেগে থাকতে দেখেছিলেন ।

নবিজির জীবনী বা সিরাত থেকে আমরা শিখতে পারি, আমাদেরও সব সময় হাসিখুশি থাকতে হবে। আমরা যত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাই হই না কেন, অঢেল টাকাপয়সার মালিক, সমাজের বহু বড়ো মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বই হই না কেন, সর্বাবস্থায় হাসিমুখে থাকতে হবে।

---

[১০৮] সুনানে আবু দাউদ : ৫০০৪

আশাবাদী হওয়া

মুমিনের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, মুমিন সব সময় আশাবাদী থাকে। তার ওপর যেকোনো বিপদ আসুক না কেন, সে ভেঙে পড়ে না। সে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে। সে জানে, আল্লাহ তাকে পথ দেখাবেন। মুমিন কেবল নিজে নিজেই আশাবাদী থাকে না, অন্যকেও তাতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

এটা তখনই সম্ভব, যখন একজন মুমিন দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখে। আপনি যত বেশি আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখবেন, জীবনে তত বেশি আশাবাদী হতে পারবেন। আর যদি আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা না রাখেন, তাহলে জীবন সম্পর্কেও আপনি নিরাশ হয়ে যাবেন। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—আমি সে রকমই, বান্দা আমার প্রতি যে রকম ধারণা রাখে।[১০৯]

আপনি যদি আল্লাহর প্রতি ইতিবাচক ধারণা রাখেন, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে ইতিবাচক কিছুই পাবেন। যদি আশা রাখেন আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেনই। যদি এমনটা মনে করেন—আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না, তবুও আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনি যেমনটা ধারণা রাখবেন, আল্লাহকে আপনার জন্য তেমনই পাবেন।

ইসলামপূর্ব আরবের লোকজন অনেক জিনিসকে কুলক্ষণ বলে মনে করত। আমাদের দেশেও দেখবেন, মানুষ অনেক জিনিসকে কুলক্ষণ মনে করে। যেমন : প্যাঁচা দেখা, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় হোঁচট খাওয়া, পাখি ডাকা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কুলক্ষণ মনে রাখা বা এসব ভাবনায় নিজেকে প্রভাবিত হওয়াকে নিন্দা করেন; তৎকালীন আরবের লোকজন যেগুলোকে কুলক্ষণ বলে মনে করত। তিনি বলেন, প্যাঁচা ও কুধারণা (বিশ্বাসের বৈধতা) নেই। আমি সুধারণা পছন্দ করি।[১১০]

নবিজির জীবনেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে তিনি যখন সুহাইল ইবনে আমরকে আসতে দেখে বলেন, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য

---

[১০৯] সহিহ বুখারি : ৭৪০৫

[১১০] সহিহ মুসলিম : ৫৬৯৬

সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এই লোকটিকে প্রেরণের অর্থ হচ্ছে কুরাইশরা সন্ধি চায়।[১১১] সুহাইল ইবনে আমর তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। নবিজি তাকে দেখে আশাবাদী হন, সুধারণা পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, তাকে পাঠানোর অর্থ হচ্ছে কুরাইশরা সন্ধি চায়। পরবর্তী সময়ে তা-ই হয়।

যেকোনো কিছুকে আমরা ইতিবাচকভাবে বা শুভলক্ষণ মনে করব কীভাবে? আলিমগণ দুটি শর্তের কথা উল্লেখ করেন।

ক. কোনো একটা ঘটনা ঘটলে সেটা নেতিবাচক ধারণা না করে, কুলক্ষণ মনে না করে সুলক্ষণ মনে করতে হবে।

খ. সেটাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। যেমন : আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে আল্লাহ কোনো কল্যাণ রেখেছেন।

আলিমগণ এ ব্যাপারে আমাদের বেশ কিছু উদাহরণও দিয়েছেন। যেমন : মনে করুন, আপনার ঘরের মধ্যে কিছু একটা হারিয়ে গেছে। সবাই মিলে খুঁজছেন। হঠাৎ আপনার সন্তান বলে উঠল, আমি মনে হয় পেয়ে গেছি। তখন আপনি সুধারণা রাখবেন, হয়তো হারানো জিনিসটি পাওয়া গেছে।

আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। দুআ শেষে বাইরে বের হয়ে দেখলেন, আকাশে রংধনু। এটাকে আপনি ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে নিতে পারেন।

ইসলামে কেন ইতিবাচক ধারণা গ্রহণযোগ্য

এর কারণ হলো, আপনি যখন ইতিবাচক ধারণা করবেন, আপনার এই ধারণাই বলে দেয়, আপনি আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখেন। যার দরুন আপনি নিজে শুধু সুধারণা রাখবেন না, অন্যকেও সুধারণা রাখতে উদ্‌বুদ্ধ করবেন। নবিজি ও সাহাবিদের জীবনে এমন ঘটনা বারবার দেখা যায়।

হিজরতের সময় নবিজির সাথে ছিলেন আবু বকর (রা.)। সাওর গুহায় তাঁরা আশ্রয় নেন। এমন সময় কাফিররা গুহার নিকটবর্তী হয়ে যায়। আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহর নিরাপত্তার কথা ভেবে ভয় পেয়ে যান। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কাফিররা তাদের পায়ের নিচের দিকে তাকায়, তাহলে তো আমাদের দেখে ফেলবে! নবিজি আবু বকর (রা.)-এর উদ্বিগ্নতা কাটানোর জন্য এবং তাঁকে আশাবাদী হওয়ার জন্য বললেন, হে আবু বকর! ওই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, আল্লাহ যাদের তৃতীয়জন?[১১২]

---

[১১১] *আর-রাহিকুল মাখতুম* : ৩৫০

[১১২] সহিহ বুখারি : ৩৬৫৩

এমন সংকটময় পরিস্থিতিতেও নবিজি তাঁর সাহাবিকে আশার বাণী শোনান, ভেঙে না পড়তে বলেন।

খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের ওপর হামলা চালাতে ১০,০০০ সৈন্য একত্রিত হয়েছে। আরবের নিকট অতীতে এর আগে কখনো এত বড়ো বাহিনী একত্রিত হয়নি। সবাই একত্রিত হয়েছে দুনিয়ার বুক থেকে মুসলিমদের নির্মূল করতে। একবার ভাবুন—আপনি সেই জায়গায় উপস্থিত আছেন, চারিদিক আবদ্ধ, বাইরে ১০,০০০ সৈন্য অস্ত্রসজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে। আপনার মানসিক অবস্থা তখন কী হবে? মুনাফিকরা সেই অবস্থার কথাই উল্লেখ করে বলেছিল—

> 'নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে লোক সমবেত হয়েছে। তোমরা তাদের ভয় করো।'[১১৩]

এত বিশাল সেনাবাহিনী দেখে মুনাফিকরা ভয় পেয়ে যায়। তারা সাহাবিদের ভয় দেখাতে থাকে। কিন্তু এত বিপুল সৈন্য দেখে সাহাবিদের প্রতিক্রিয়া ছিল বিপরীত। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তা উল্লেখ করে বলেন—

> 'কিন্তু তা (বিশাল সেনাবাহিনী) তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলছিল—আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই-না উত্তম কর্মবিধায়ক।'[১১৪]

বিশাল সেনাবাহিনী দেখে সবাই ভয় পেলেও মুসলিমরা ভয় পায়নি। তারা সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছে, পাশাপাশি আল্লাহর ওপরও ভরসা করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের সহযোগিতা করেন।

ফেরাউন ও মুসা (আ.)-এর ঘটনায় দেখা যায়—মুসা (আ.) বনি ইসরাইলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তারা সমুদ্রের মুখোমুখি, পেছনে ফেরাউনের বিশাল সেনাবাহিনী। সামনে বিপদ, পেছনেও বিপদ। তাদের যাওয়ার এবং আশ্রয়ের কোনো স্থান নেই। তাদের সঙ্গে নৌকা নেই, জাহাজ নেই এবং শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো তেমন অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। সেই মুহূর্তে মুসা (আ.)-এর সাথে থাকা লোকজন বলে উঠল—

> 'আমরা ধরা পড়ে গেলাম!'[১১৫]

তারা বাঁচার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল এখান থেকে আর বেঁচে ফেরা সম্ভব না। কিন্তু মুসা (আ.) হাল ছাড়েননি। সেই কঠিন মুহূর্তে তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন। আর বলেন—

---

[১১৩] সূরা আলে ইমরান : ১৭৩

[১১৪] সূরা আলে ইমরান : ১৭৩

[১১৫] সূরা শুআরা : ৬১

'কখনোই নয়! আমার রব আমার সাথে আছে, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।'[১১৬]

আশাবাদী মুসা (আ.)-এর কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ সত্যি সত্যি তাঁদের পথ দেখান। লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করার সাথে সাথেই সমুদ্রের পানি দুই দিকে ভাগ হয়ে যায়। তাঁরা খুব সহজে সমুদ্র পার হন। শত্রুবাহিনী আর তাঁদের ধাওয়া করতে পারেনি।

আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করলে আল্লাহর তরফ থেকে এমন সাহায্য পাবেন। এমন এমন জায়গা থেকে আল্লাহর সাহায্য আসবে, যা কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনার যে শত্রু ছিল, দেখা যাবে সে-ও আপনার বন্ধু হয়ে গেছে। যে সব সময় চাইত আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হোন, দেখবেন সে নিজেই আপনার আসন্ন কোনো বিপদ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এমন বিশ্বাসী আমাদের হতে হবে, যা হওয়ার হোক, অবিরাম চেষ্টা চলবে, আল্লাহর ওপর ভরসা থাকবে; তিনি আমাদের ভাগ্যে যতটুকু রেখেছেন, আমরা ঠিক ততটুকুই পাব। এমন মনোভাবের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দেন। তিনি বলেন—

'আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো বিপদ আমাদের ওপর আপতিত হবে না।'[১১৭]

এই ধরনের মনোভাব অন্তরে রোপণ করে রাখলে আমরা কখনোই ভেঙে পড়ব না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

'তোমরা লোকদের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে।'[১১৮]

জনৈক আলিম বলেন—'উত্তমভাবে কথা' বলতে দুটি বিষয় বোঝায় । যেমন :

ক. মানুষকে ইসলামের কথা বলবেন, ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেবেন।

খ. মানুষকে সব রসময় উৎসাহ দেবেন, যাতে তারা বিপদের সময় ভেঙে না পড়ে।

একজন ব্যক্তির ওপর দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে গেলেও আপনি তাকে ভেঙে না পড়তে উৎসাহ দিন। নতুন করে আবার সবকিছু শুরু জন্য উদ্দীপনা জোগান। মনে করুন, একজনের বাবা/মা/স্বামী মারা গেছে। আপনি তাকে কী বলবেন?

---

[১১৬] সূরা শুআরা : ৬২

[১১৭] সূরা তাওবা : ৫১

[১১৮] সূরা বাকারা : ৮৩

একবার নবিজি চলার পথে দেখতে পান একজন নারী কবরের পাশে বসে কান্না করছে। নবিজি তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধরো।[১১৯]

অনেক সময় আপনার আশপাশের মানুষজন আপনার কাছ থেকে সামান্য হলেও একটি ইতিবাচক কথা শুনতে চায়। আশাবাদী হতে চায়। সেক্ষেত্রে তাঁদের নিরাশ না করে আশার আলো দেখান। কেউ যদি তার জীবনে খুব বেশি পাপ করে, তারপরও আপনি তাকে আশার কথা শোনান। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ পাপীদের আশাবাদী হতে বলেছেন। তারা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়—আল্লাহ তাদের ক্ষমার কথা বলেছেন, আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেছেন।

একজন মুমিন যদি কোনো কিছু হারিয়ে ফেলে তারপরও সে ধারণা করে—আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে উত্তম কিছু দান করবেন। মুমিন নিজে যেমন আল্লাহর প্রতি ইতিবাচক ধারণা রাখে, তেমনই অন্যদের ইতিবাচক হতে উৎসাহিত করে।

---

[১১৯] সহিহ বুখারি : ১২৫২

অন্যের ব্যাপারে সুধারণা

একজন মুমিন তার অস্পষ্ট কথাগুলোকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করে। আমরা প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের সাথে কথা বলি। দেখাসাক্ষাৎ এবং মেইল আদান-প্রদান করি। এসব ক্ষেত্রে কেউ কেউ এমন কথা বলতে পারে, যে কথার নানান অর্থ হতে পারে। কিন্তু মুমিন এসব অস্পষ্ট কথাগুলোর নেতিবাচক অর্থ দাঁড় করায় না। পবিত্র কুরআনে সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাকো। কারণ, কোনো কোনো অনুমান পাপ!'[১২০]

আপনি যখন কোনো বিষয়ে বা কারও ব্যাপারে মন্দ ধারণা করেন, সেটা সত্য কিংবা মিথ্যা হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানিয়ে দেন, বেশির ভাগ অনুমান থেকে যেন আমরা দূরে থাকি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। ব্যতিক্রমের ব্যাপারটা নিয়ে পরে আলোচনা করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণার ব্যাপার নিয়ে আমাদের সতর্ক করে বলেন, তোমরা কারও প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড়ো মিথ্যা।[১২১]

ধরুন, আপনার বাসায় কেউ একজন বেড়াতে এলো। সে চলে যাওয়ার পর আপনি আপনার মোবাইল খুঁজে পাচ্ছেন না। ধারণা করে নিচ্ছেন, সে চুরি করেছে। আর এ কথা আশপাশের কয়েকজনকে বললেন। তারপর যে বাসায় এসেছিল, তাকেও জিজ্ঞেস করলেন, আমার মোবাইলটা কি দেখেছ?

দুদিন পর দেখা গেল আপনার বালিশের নিচে মোবাইলটা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। আপনি বেমালুম ভুলে গিয়েছেন, এটা বিছানার ওপর বালিশের কাছে ছিল। দেখুন, ধারণার বশবর্তী হয়ে একজনের ব্যাপারে অপবাদ দিলেন। তাকে লজ্জা দিলেন। এখন কি আর তার সাথে কখনো ভালো সম্পর্ক হতে পারে?

---

[১২০] সূরা হুজুরাত : ১২

[১২১] সহিহ বুখারি : ৫১৪৩

আয়িশা (রা.)-এর ঘটনায় দেখা যায়, যারা অপবাদ রটিয়েছিল তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। অপবাদ রটনাকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যেমন শাস্তির কথা উল্লেখ করেন, বাকিদের ব্যাপারেও তিনি বলেন—

> 'এ কথা শোনার পর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করেনি এবং বলেনি—এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ?'[১২২]

এই আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ঘটনাটি শোনার পর সাহাবিরা কেন আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করেননি। তাঁরা এখনও কেন মন্দ ধারণা করেন?

উম্মে আইয়ুব (রা.) তাঁর স্বামী আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আয়িশা (রা.) সম্পর্কে যেসব কথা বলাবলি হচ্ছে সেগুলো শুনেছেন? আবু আইয়ুব আনসারি স্ত্রীর এমন প্রশ্ন শুনে তার অবস্থান জানিয়ে দিলেন এবং বললেন—হ্যাঁ, শুনলাম। তবে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

এ কথা বলে তিনি উদাহরণ দিলেন, আচ্ছা উম্মে আইয়ুব! বলো তো, তুমি এমন কাজ করতে পারতে? উম্মে আইয়ুব বললেন—নাউজুবিল্লাহ! না, কখনোই না, এমন কাজ আমি করতেই পারি না। এটা আমার জন্য অসম্ভব। আবু আইয়ুব স্ত্রীকে বোঝালেন—দেখো, তোমার চেয়ে আয়িশা (রা.) শতগুণে উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি এমন কাজ কীভাবে করতে পারেন?[১২৩]

আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) এমন উদাহরণের মাধ্যমে শেখালেন, কোনো গুজব বা ধারণাপ্রসূত কথা প্রমাণিত হওয়ার আগপর্যন্ত একজন মানুষের ব্যাপারে কীভাবে সুধারণা করতে হয়। নিজের স্ত্রীর উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন—যেখানে তুমি এমন কাজ করতে পারো না, সেখানে আয়িশা (রা.) কীভাবে এমন কাজ করতে পারেন?

এখন প্রশ্ন হতে পারে, কীভাবে আমরা অন্যের ব্যাপারে সুধারণা রাখব?

কে আপনাকে নিয়ে কী বলল সেটা ভুলে যান

কেউ যদি কোনো কথা বলে, সেটা নিজের ওপর টেনে নেবেন না। আগে কথাটি পরিষ্কারভাবে শুনুন, বুঝুন। কেউ যদি বলে, গরু চোরেরা সাবধান। এখন আপনার বংশেরই কেউ যদি গরুর চোর থাকে, তাহলে সেটা শুনে রাগ

---

[১২২] সূরা নুর : ১২

[১২৩] *তাফসির ইবনে কাসির*; সূরা নুরের ১২ নম্বর আয়াতের তাফসির।

করার কিছু নেই। কথাটা একদমই সাধারণ কথা, একে সাধারণভাবেই রাখুন। নিজের ওপর টেনে নিলে বোঝা যাবে, কথাটির সাথে আপনি প্রাসঙ্গিক।

অনুমান অনেক ক্ষেত্রে এমন কিছু বোঝায়; যে অনুমান করে, সে একটি জিনিস বোঝে, যে কথাটি বলে সে মূলত সেটা বোঝায়নি। আপনি যদি মনে করেন সবাই বিপথগামী হয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে। আদতে দেখা যাবে সবাই ঠিক আছে, আপনিই বিপথগামী হয়ে গেছেন। এজন্য নবিজি বলেন, কোনো ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অর্থহীন কথা বা কাজ এড়িয়ে চলা।[১২৪]

ভালো ধারণার চেষ্টা করা

কারও কোনো কথা শুনে যদি মনে হয় কথাটি সে আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, কথার মাধ্যমে আঘাত করেছে, তাহলে সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে ধরে নিন—সে এই উদ্দেশ্যে বলেনি। কথাটির পেছনে তার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, যা আপনি এখন বুঝতে পারছেন না। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন—তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে এমন কিছু যদি শোনো, যা তোমাকে কষ্ট দিতে পারে, সেক্ষেত্রে তুমি ৭০টি অজুহাত দেখাও। যদি তা না পারো, তাহলে ধরে নাও তার কাছে হয়তো এর কোনো ব্যাখ্যা আছে যা আমি জানি না।'[১২৫]

নবিজির জীবনে এ রকম একটি ঘটনা দেখা যায়।

—জনৈক সাহাবি তাঁর কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। অথচ আমি কালো নই!

—সেই সাহাবি যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট। স্ত্রীর ব্যাপারে তিনি সন্দেহ করেন। তাঁর সন্দেহের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রশ্ন করেন, তোমার কাছে কি কোনো উট আছে?

—সাহাবি বললেন, হ্যাঁ, আমার কাছে উট আছে।

—সেগুলোর রং কী রকম?

—লাল রঙের।

—তাতে কি কালো (মেটে) রঙের উট আছে?

—সাহাবি বললেন, হ্যাঁ, কালো রঙের উটও আছে।

—নবিজি জিজ্ঞেস করেন, এই কালো রং কোত্থেকে এলো?

---

[১২৪] জামে আত-তিরমিজি : ২৩১৮

[১২৫] ইমাম বায়হাকি, *শুআবুল ঈমান* : ৭৮৫৩

—সাহাবি বললেন, সম্ভবত তা পূর্ববর্তী বংশধারা থেকে এসেছে।

—অতঃপর নবিজি বললেন, তোমার এই কালো সন্তানটিও সম্ভবত পূর্ববর্তী বংশধারা থেকে এসেছে।[১২৬]

সাহাবি এসেছিলেন স্ত্রীর ব্যাপারে মন্দ ধারণা নিয়ে, নবিজি বাস্তব একটি উদাহরণ দিয়ে সাহাবির মনের সংশয় দূর করেন।

যাচাই করে নেওয়া

কোনো বিষয়ে মনে সন্দেহ দেখা দিলে সেটা যাচাই করে নিন। আপনি মনে করেছেন কেউ আপনাকে নিয়ে কিছু বলেছে। মাথা থেকে এটা দূর করতে পারছেন না। সেই মুহূর্তে আপনি সরাসরি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন—সেদিন যা বলেছিলে, অল্প হলেও এর ব্যাখ্যা বলো। আমি আসলে বুঝিনি। আপনি তাকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেবেন। এতে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও।'[১২৭]

আপনার কাছে যে কেউ যেকোনো সংবাদ নিয়ে এলে আগে তা যাচাই করে নিন। 'চিলে কান নিয়ে গেল' শুনে চিলের পেছনে ছুটবেন না। আগে হাত দিয়ে দেখুন, আপনার কান ঠিক আছে কি না। কারও ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছার আগে তথ্যটি খুব ভালোভাবে যাচাই করে নিন, নিশ্চিত হয়ে নিন। তথ্যের ব্যাপারে বিভিন্ন উৎস থেকে জানার চেষ্টা করুন।

নবিজির জীবনীতে আমরা দেখতে পাই—তিনি কোনো সংবাদ শোনার পর কারও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাকে কথা বলার সুযোগ দিতেন। নিজেকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিতেন। সংবাদ বা তথ্যের যথাযথ কারণ জানার চেষ্টা করতেন।

রাসূলুল্লাহর জীবনে এ রকম একটি ঘটনা দেখতে পাই। মক্কা বিজয়ের পূর্বে একজন বদরি সাহাবি মুসলিমদের মক্কা অভিযানের সংবাদ চিঠি আকারে লিখে মক্কায় জানিয়ে দিতে চান। তাঁর নাম ছিল হাতিব ইবনে আবু বালতায়া (রা.)। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটা বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি মুসলিমদের সাথে

---

[১২৬] সহিহ মুসলিম : ৩৬৫৮

[১২৭] সূরা হুজুরাত : ৬

বিশ্বাসঘাতকতা করে মক্কায় আগাম সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন। চিঠিটি তিনি একজন মহিলার কাছে দেন। সে তা নিয়ে মক্কার পথে রওনা দেন।

নবিজি ওহি মারফত খবরটি জানতে পারেন। তারপরও আলি ইবনে আবি তালিব ও জুবাইর ইবনে আবু বালতাআ (রা.)-কে পাঠালেন চিঠিটি উদ্ধার করতে। উদ্ধারের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাম হাতিব (রা.)-এর কাছে কারণ জানতে চান। তিনি বলেন, তাঁর পরিবার মক্কায় আছে। তিনি কুরাইশদের আগাম সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন এই আশায়, মক্কায় আক্রমণ হলে তারা যেন তাঁর পরিবারকে সুরক্ষা দেয়।

হাতিব (রা.)-এর চিঠি প্রেরণের কারণ জানার আগপর্যন্ত মনে হতে পারে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তবে কারণ বলার পর মনে হয় তিনি মূলত তাঁর পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ায় চিঠি পাঠিয়েছেন। ফলে নবিজি তাঁকে ক্ষমা করে দেন।[১২৮]

আপাতদৃষ্টিতে কেউ যদি শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ করে করে, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তার কাছ থেকে এর কারণ সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। শোনার পর কারণটি যথাযথ হলে তাকে ক্ষমা করা যায়। উল্লিখিত ঘটনাটিই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা সবাই কোনো না কোনো ভুল করি। যেহেতু সবারই কমবেশ ভুল হয়, তাই অন্য কেউ কখনো ভুল করলে তা আমলে নিতে হবে। সুযোগ দিতে হবে তাকে, অতঃপর সেটা যদি শাস্তি দেবার মতো ভুল বা অপরাধ হয় তবেই শাস্তি দিতে হবে।

নবিজির একজন সাহাবি ছিলেন মদ্যপায়ী। নাম আবদুল্লাহ (রা.)। প্রায়ই মদ পানের অভিযোগে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। একবার শাস্তি দেওয়ার সময় আরেকজন সাহাবি বললেন, হে আল্লাহ! তার ওপর আপনার লানত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার যে আনা হলো! রাসূলুল্লাহ সাহাবির এমন উক্তির প্রতিবাদ করে বললেন, তাকে লানত করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।[১২৯]

একজন মদ্যপায়ী সাহাবির ভালো গুণের প্রশংসা যেমন নবিজি করেন, তেমনই মদ পানের জন্য তাকে শাস্তিও দেন। অন্যরা তাকে লানত দিতে চাইলে তিনি সেই সাহাবির পক্ষে কথা বলেন। কারণ, সেই সাহাবি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন।

---

[১২৮] সহিহ বুখারি : ৬৯৩৯; *সিরাত ইবনে হিশাম* : ৪/৩৭-৩৮; *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/৪৮৮-৪৮৯

[১২৯] সহিহ বুখারি : ৬৭৮০

মাঝেমধ্যে কেউ আমাদের এমন কোনো কথা বলতে পারে, সেই কথাকে নেতিবাচকভাবে নিলে সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে, মনোমালিন্য হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আমরা কথাগুলোকে ইতিবাচকভাবে নিতে পারি বা সচেতনভাবে এড়িয়ে যেতে পারি, এতে সম্পর্ক রক্ষা পায়।

তবে এমন উদারতাকে অন্য কেউ 'দুর্বলতা' না ভাবে, সেই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ক্ষমাশীলতাকে কেউ সরলতা ভেবে যেন কোনো প্রকার সুযোগ নিতে না পারে। নবিজি আমাদের এই ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত মুমিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।[১৩০]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—'বেশির ভাগ ধারণা পাপ'; আল্লাহ কিন্তু বলেননি 'সকল ধারণা পাপ'। কেউ আমাদের সাথে অনবরত দুর্ব্যবহার করে গেলে, তার কাছ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে আমরা অবশ্যই সতর্ক থাকব।

[১৩০] সহিহ বুখারি : ৬১৩৩

ইসলাম নিয়ে গর্ববোধ করা

একজন মুমিন সব সময়ই তার ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করে। ইসলাম নিয়ে কখনোই হীনম্মন্যতায় ভোগে না। এটি মুমিনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। কেউ কেউ মনে করতে পারেন—ইতঃপূর্বে আমি মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য বলেছি বিনয় দেখান। এখন যদি বলি আরেকটি বৈশিষ্ট্য গর্ব করা। তাহলে দুটি বৈশিষ্ট্য বিপরীত হয়ে গেল না?

না, এই দুটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর বিপরীত না। মুমিন যখন নিজের ধর্ম নিয়ে গর্ব করবে, তখন সে নিজেকে নিয়ে গর্ব করবে না। সে বলবে না, আমি অন্যের চেয়ে ভালো মুসলিম বা বেশি আমলদার। সে গর্ব করবে এই ভেবে—আমি যে ধর্মের অনুসরণ করি, এই ধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সে বলবে—আল্লাহ আমাকে এমন এক ধর্মের অনুসারী বানিয়েছেন, যে ধর্ম তাঁর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য। এই গর্বের কারণ সে নিজে না; বরং সে যা অনুসরণ করে তা। কুরআনে আল্লাহ বলেন—

'যে সম্মান চায়, তার জানা উচিত—আল্লাহর জন্যই সকল সম্মান।'[১৩১]

সকল সম্মান আল্লাহর কাছেই। এই সম্মান আল্লাহ কাকে দেন? পবিত্র কুরআনে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন—

'সম্মান তো আল্লাহরই; আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের।'[১৩২]

সম্মানবোধ আর অহংকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইসলাম নিয়ে গর্ব করা, নিজেকে সম্মানিত মনে করা আর অহংকার করা এক না। আমি যখন ইসলাম নিয়ে গর্ব করব, এর মানে দাঁড়ায়, আমি বলছি—আল্লাহ আমাকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন। আমি সুমহান দ্বীনের পথ অনুসরণ করছি, যে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে নবি-রাসূলগণ এসেছিলেন। এটা আমার কৃতিত্ব না। আমি এর জন্য অহংকার করছি না; বরং গর্ববোধ করছি। অহংকারের সঙ্গে 'আমার' কোনো সম্পর্ক নেই, আমি কীসের অনুসরণ করছি সম্পর্ক সেটার সাথে। এই ধরনের গর্ববোধ,

---

[১৩১] সূরা ফাতির : ১০

[১৩২] সূরা মুনাফিকুন : ৮

আত্মসম্মান প্রত্যেক মুমিনের থাকা উচিত। একজন মুমিন কখনোই তার ধর্ম নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে না। নবিজি বলেন, কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য নিজেকে অপমানিত করাটা শোভনীয় নয়।[১৩৩]

কেউ যদি কখনো ইসলাম নিয়ে হাসি-তামাশা করে, ধর্মের অবমাননা করে, অবশ্যই আমরা এর বিরুদ্ধে কথা বলব। কেউ যদি ধর্ম নিয়ে খোঁটা দেয়, সেখানে মুমিন কখনো লজ্জিত হতে পারে না। কারণ, তার ধর্ম নিয়ে সে আত্মবিশ্বাসী, প্রজ্ঞার সাথে এসব অপপ্রচারের জবাব দেবে।

অনেকেই দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য নিজের নাম, সন্তানের নামের সাথে ইসলামি কোনো নাম সন্নিবেশ করতে হীনম্মন্যতায় ভোগে। তারা মনে করে, যদি নামের সাথে ইসলামের কোনো নিদর্শন থাকে, তাহলে যদি ওই দেশে ঢুকতে না দেয়? দাড়ি রাখার দরুন যদি 'জঙ্গি' বলে, এই ভেবে অনেকেই দাড়ি রাখতে ভয় পায়। নামাজ পড়লে স্যার যদি কিছু মনে করেন, অফিসের বস যদি নারাজ হন—এই ভয়ে কেউ কেউ নামাজ পড়া বাদ দিয়ে দেয়।

তারা দ্বীনের চেয়ে মানুষকে বেশি মূল্য দেয়। দ্বীনের ব্যাপারে তারা আত্মবিশ্বাসী না। বিধিবিধান মানার ব্যাপারে গর্ববোধ করে না, কেমন যেন লজ্জাবোধ করে। এই ধরনের মনোভাব কোনো মুমিনের হতে পারে না।

রাসূল ও সাহাবিদের জীবনী পড়লে আমরা এমন দৃশ্য দেখতে পাই। তাঁদের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। নামাজরত অবস্থায় ময়লা-আবর্জনা তাঁদের ওপর ঢেলে দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়স্বজনকে করুণভাবে হত্যা করা হয়েছে। শারীরিক-মানসিক সব দিক থেকেই নির্যাতন করা হয়েছে। তবুও তাঁরা দ্বীনের ওপর অটল ছিলেন। কেউ তাঁদের আত্মবিশ্বাস থেকে সামান্য পরিমাণও টলাতে পারেনি।

এখনকার সময়ে দেখা যায়, ব্যক্তি তার সমাজ এবং দেশীয় সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করে। সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে, অপ্রথম ও প্রধান পরিচয় হলো আমরা মুসলিম। বাকি অন্যান্য পরিচয় হলো মুসলিম পরিচয়ের পরের পরিচয়। এখন কেউ কেউ ভাবতে পারেন, তাই বলে কি আমরা দেশীয় সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করব না?

হ্যাঁ, অবশ্যই করবেন। তবে সেটা শর্তযুক্ত। ইসলাম আপনাকে যতটুকুর অনুমোদন দিয়েছে, ঠিক ততটুকুই। ধরুন, বাংলাদেশে পদ্মার ইলিশ পাওয়া যায়। এই ইলিশ খেতে এতই সুস্বাদু, পৃথিবীর অনেক দেশে নানান নদীর ইলিশ

---

[১৩৩] জামে আত-তিরমিজি : ২২৫৪

খেয়ে আপনি এতটা মজা পাননি। এজন্য গর্ববোধ করতে পারেন—আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে এমন এক দেশে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন, যে দেশের ইলিশ পৃথিবীর সব দেশের ইলিশের চেয়ে সুস্বাদু।

কিন্তু আপনি যেই মুহূর্তে আরেকটি দেশের মানুষের চেয়ে নিজেকে উত্তম মনে করবেন, অমুক লোকটি আরেক দেশে জন্মগ্রহণ করেছে বলে তাকে আপনার চেয়ে হীন মনে করবেন—সেটা সমস্যাজনক, ভেতরে অহংবোধের জন্ম নেবে।

ধরুন, আপনি ভাবছেন—অমুক ব্যক্তি পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছে বলে খারাপ বা সৌদি আরবের কেউ যদি মনে করে অমুক মুসলিম লোকটা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে বিধায় সে খারাপ মুসলিম; এটা বর্ণবাদী মনোভাব। আবার আপনি যদি মনে করেন—আপনার গায়ের রঙের কারণে আপনি নাইজেরিয়ার মানুষের চেয়ে উত্তম, তাহলে আপনি বর্ণবাদী। তেমনই ইউরোপের কেউ যদি মনে করে তারা তাদের গায়ের রঙের কারণে পৃথিবীর বাকিদের চেয়ে উত্তম এবং সেরা; এটাও বর্ণবাদী মনোভাব। আমাদের একমাত্র শর্তহীন আনুগত্য ইসলামের জন্য। অন্য কোনো পরিচয়ের ক্ষেত্রে আমরা এমন আনুগত্য দেখাব না।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) একবার জেরুজালেম যাবেন বলে প্রস্তুতি নেন। তাঁর হাতে হস্তান্তর করা হবে বায়তুল মুকাদ্দাসের চাবি। রওনা হন জীর্ণশীর্ণ জামা পরে। সাহাবিরা তাঁকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন একটি ভালো জামা পরেন। কারণ, তিনি একটি বিত্ত ও সমৃদ্ধশালী অঞ্চলে যাচ্ছেন, সেখানে অনেক লোক আসবে তাঁর সাথে দেখা করতে। এমন পোশাক দেখে বাকিরা হয়তো তাঁকে অবজ্ঞা করতে পারে। সাহাবিদের পরামর্শ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আমলে নিলেন না। তিনি বললেন, আমরা ছিলাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। আল্লাহ আমাদের ইসলাম দ্বারা সম্মান দান করেছেন। সুতরাং, আল্লাহ আমাদের যা দ্বারা সম্মান দান করেছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো জিনিস দ্বারা যখন আমরা সম্মান অনুসন্ধান করব, তখনই তিনি আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।[১৩৪]

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সম্মানিত, বিপুল সম্পদে ভরপুর অঞ্চলে যাওয়ার সময় পোশাক পরিবর্তন করেননি। যে ধরনের পোশাক পরে নবিজির যুগ, সাহাবিদের যুগ কাটান, সেই ধরনের পোশাক পরেই তিনি জেরুজালেম যান। কারণ, তিনি মনে করতেন, পোশাকের সাথে সম্মানের সম্পর্ক নেই। সম্মানের সম্পর্ক ইসলামের সাথে।

---

[১৩৪] *মুস্তাদরাকে হাকিম* : ৪৪৮১

ইসলাম নিয়ে কখনোই হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না। ইসলাম এমন কোনো ধর্ম না যে, হীনম্মন্যতায় ভুগবেন। কেননা, আমরা যখন ইসলাম মেনে চলব, আল্লাহ আমাদের সম্মান দান করবেন। ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও সম্মান তালাশ করলে সম্মান খুঁজে পাব না; বরং আল্লাহ আমাদের অপদস্থ করবেন।

নামাজের সময় হলে নামাজে যান। আপনার 'বস' কী মনে করবেন, শিক্ষক কী মনে করবে এটা ভাবলে তো হবে না। যানবাহনে নামাজ পড়া লাগলে সেখানেই নামাজ শুরু করুন। লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

আজ থেকে ২০ বছর আগের ঘটনা। আমি একবার এয়ারপোর্ট যাই এক জায়গায় যাব বলে। দেখলাম একজন মহিলা 'ইয়োগা' (ব্যায়াম) করছে। যাত্রা শুরুর আগে আধা ঘণ্টা বিরতি পেয়েছিল, বিরতির সময়টা সে কাজে লাগাচ্ছে ব্যায়াম করে।

সেদিনই আমার ভেতর এ কথার উদ্রেক হয়—একজন মহিলা দুনিয়াবি একটি কাজ জনসম্মুখে করতে ভয় পাচ্ছে না, তার সংকোচ হচ্ছে না, সামান্য লজ্জাও পাচ্ছে না। আমি কেন শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের প্রয়োজনে জনসম্মুখে নামাজ পড়তে পারব না?

এমন কোনো পরিস্থিতি যদি আসে, যেখানে রাস্তার পাশে আমাকে নামাজ পড়তে হবে, দাঁড়িয়ে যাব। কে কী বলবে, কে কী মনে করবে ভাবলে চলবে না। তবে কাজটা আমার ধর্মে প্রতি অনুরাগ ও প্রজ্ঞার সাথে করতে হবে। আশপাশে কোনো সিকিউরিটি থাকলে তাদের জানিয়ে দেবো, আমি নামাজ পড়ছি। অন্য কিছু মনে করার কারণ নেই।

আপনি নামাজ পড়লে এ নিয়ে অনেকেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে পারে। এমনটা ভাববেন না যে, আপনিই প্রথম। ইসলামের শুরু থেকেই এহেন কর্ম হয়ে আসছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যখন তোমরা নামাজের দিকে আহ্বান করো, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। এর কারণ—তারা নির্বোধ।'[১৩৫]

নির্বোধরা ইসলাম নিয়ে সমালোচনা করবে, নামাজ পড়া নিয়ে সমালোচনা করবে। তাই বলে নির্বোধের কথায় পাত্তা দিলে চলবে না। আমরা এমন এক ধর্মের অনুসরণ করি, যেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এই ধর্ম নিয়ে আমরা গর্বিত।

---

[১৩৫] সূরা মায়েদা : ৫৮

লজ্জা : ঈমানের অঙ্গ

মুমিনের গুণাবলির মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হলো লজ্জাশীলতা। যার মধ্যে লজ্জাবোধ নেই, তার ঈমান নেই। একজন মুমিনের মধ্যে অবশ্যই লজ্জাবোধ থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মুসা (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে দুজন নারীর কথা উল্লেখ করেন। মুসা (আ.) ফেরাউনের দরবার থেকে পালিয়ে যখন মাদায়েন যান, তখন তাদের দেখতে পান। নারীদের একজনের হাঁটার ধরনের কথা উল্লেখ করে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'অতঃপর নারীদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তার কাছে এসে বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন।'[১৩৬]

এই নারী পরবর্তী সময়ে মুসা (আ.)-এর স্ত্রী হন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাঁর লজ্জাশীলতার প্রশংসা করেন। তিনি যখন মুসা (আ.)-এর সাথে কথা বলতে আসেন, তখন এমনভাবে হেঁটে আসেন, তাঁর হাঁটার মধ্যে লাজুকতা প্রকাশ পাচ্ছিল। এই গুণটি আল্লাহ তায়ালা ভীষণ পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীল, গোপনীয়তা অবলম্বনকারী। তিনি লজ্জা ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন।[১৩৭]

আমাদের সকল নবিই লজ্জাশীল ছিলেন। লজ্জাশীল ছিলেন স্ত্রীরাও। এ গুণ আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয়। নবিজি বলেন, ঈমানের শাখা ৭০টিরও বেশি। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।[১৩৮]

একবার নবিজি সাহাবিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন এক সাহাবি আরেক সাহাবিকে বললেন, তুমি এত লজ্জা পাও, কীসের এত লজ্জা তোমার? রাসূলুল্লাহ তখন লজ্জাশীল সাহাবির প্রশংসা করে বলেন, লজ্জাশীলতায় কল্যাণ ছাড়া কোনো কিছু নেই।[১৩৯]

---

[১৩৬] সূরা কাসাস : ২৫

[১৩৭] সুনানে আবু দাউদ : ৪০১২

[১৩৮] সহিহ মুসলিম : ৫৮

[১৩৯] সহিহ বুখারি : ৬১১৭

এখন প্রশ্ন হলো, লজ্জাশীলতা কী?

এমন কিছু থেকে বিরত থাকা, যে কাজ করলে অন্য কেউ আপনার সমালোচনা করতে পারে। সে তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ত্রুটি ঢেকে রাখতে চায়। অন্যের সামনে সেগুলো প্রকাশ করতে চায় না। নবিজি বলেন, প্রথম যুগের নবি-রাসূলগণের উক্তিসমূহের মধ্যে যা মানবজাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি—যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো।[১৪০]

নিম্নস্তরের কোনো কিছু করার শেষ লাইন হলো লজ্জা। আপনি কোনো পাপ কাজ করতে পারছেন সেটা এজন্য, কারণ লজ্জার সীমা অতিক্রম করেছেন। মানুষ যখন লজ্জার সীমা অতিক্রম করে, তখন খুব সহজেই পাপাচারে লিপ্ত হতে পারে।

আমরা এমন একসময়ে বসবাস করছি, যখন মানুষের মধ্য থেকে লজ্জা-শরম একেবারেই উবে গিয়েছে। এখনকার সময়ে লোকসম্মুখে স্বভাবতই কেউ যদি কোনো কিছু নিয়ে লজ্জা পায়, তাকে নিয়ে মানুষ ঠাট্টা করে। কেউ যদি বলে, আমি মেয়েদের দিকে তাকাই না। এ কথা শুনে তার বন্ধুরা হাসিতে ফেটে পড়ে। কারণ, যে বন্ধুটা লজ্জা পায়, তারা তাকে অদ্ভুত মনে করে! অথচ হওয়ার কথা ছিল এর উলটো। হাসিঠাট্টা নয়, বন্ধুকে কাছে ডেকে তার প্রশংসা করা উচিত ছিল।

আমি বড়ো হই আশির দশকে। যারা টিভি দেখত, আমার আম্মা-আব্বা তাদের সমালোচনা করতেন। বলতেন, আস্তাগফিরুল্লাহ! দেখো সে টিভি দেখছে।

অথচ আমাদের এই সময়ে এসে টিভি দেখা খাবার খাওয়ার মতো স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। চিন্তা করি—আমার সন্তানেরা যা দেখছে, যেভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংযুক্ত হচ্ছে—ভবিষ্যৎ কেমন হবে, ভয় হয় তাদের নিয়ে। টিভি দেখাকে আমার আব্বা-আম্মা ভয় পেতেন। আর আমরা এখন ভয় পাচ্ছি তার চেয়েও কঠিন এবং বেশি কিছু নিয়ে।

এক প্রজন্মের মধ্যেই এত কিছুর বদল! মোটামুটি সবার মধ্য থেকে লজ্জাবোধ উবে গেল। ছোটোবেলায় দেখতাম সিনেমা দেখতে গিয়ে গানের সিন এলে টিভি বন্ধ করা হতো। আবার কয়েকজন উঠেও যেত। এখন টিভিতে পরিবারসহ সবাই মিলে যা যা দেখে, সেটা তখনকার সময়ের সাথে মেলালে কল্পনাই করা যায় না। আজ থেকে দুই যুগ আগের মানুষ এমনটা ভাবতেই জানত না।

---

[১৪০] সহিহ বুখারি : ৩৪৮৪

আপনার ঘরে টিভি, মোবাইল না থাকলেও আপনি এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পাবেন না। পরিবার-সন্তানদের নিয়ে যখন কোথাও বেড়াতে যাবেন, বিকেলে হাঁটতে রাস্তায় বেরোবেন, ভয়ংকর বিলবোর্ডের দিকে চোখ যাবে। স্মরণ করলে দেখা যাবে, বিলবোর্ডের এমন দৃশ্য আজ থেকে ২৫-৩০ বছর আগেও ছিল না।

হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই—আমরাই শেষ প্রজন্ম, যারা লজ্জাশীলতাকে ধারণ করে আছি। এক্ষেত্রে যদি আমরা ভুল করি, চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারি, তাহলে মানবজাতির মাঝে যে লজ্জাশীলতা বলে একটা কিছু আছে, তা একেবারেই মুছে যাবে। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীরা আমাদের মতো লজ্জাশীলতার চর্চা করে না। তাদের মাঝে লজ্জাবোধের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি যারা মূলধারা হিসেবে নিজেদের দাবি করে, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

যখন সবার মাঝেই লজ্জাশীলতার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তখন আমাদের দায়িত্ব বেড়ে যায়। মানবজাতিকে জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় লজ্জাশীলতা কী? আমাদের সন্তানদের লজ্জার বিষয়টি শেখাতে হবে। যদিও নিজেদের মধ্যে এর চর্চা অব্যাহত রাখলেই সন্তানরা সহজে বুঝবে, ধারণ করতে পারবে।

আরেকটি জিনিস আমাদের বুঝতে হবে। যারা অমুসলিম, তারা হয়তো লজ্জাশীলতার চর্চা ওভাবে করে না। কিন্তু তাদের ফিতরাত তাদের জানিয়ে দেয়, লজ্জাশীলতা একটি ভালো গুণ। ফলে তাদের কেউ যখন এমন গুণ দেখতে পায়, তখন প্রশংসা করে।

অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার অন্যতম সহজ উপায় হলো লজ্জাশীলতার গুণ অর্জন করা। আপনি যখন এই গুণের মাধ্যমে তাদের দাওয়াত দেবেন, সন্তুষ্টচিত্তে তারা সেই গুণের প্রশংসা করবে। কারণ, আশেপাশে এমন গুণসম্পন্ন মানুষ সচরাচর তারা দেখতে পায় না। প্রাথমিকভাবে হয়তো লজ্জাশীলতা নিয়ে হাসি-তামাশা করতে পারে, কিন্তু এর অন্ধত্ব শেষ হলে ঠিকই তারা এই গুণের স্বীকৃতি দেবে।

আমি একজন নারীর পরিচয় জানি এবং ব্যক্তিগতভাবেও তাকে চিনি। সেই নারী একজন মুসলিমের লজ্জাশীলতার এই গুণ দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি খেয়াল করেন অফিসের সবাই তার সাথে ফ্ল্যার্ট করে, পটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু একজন পুরুষ তাকে এড়িয়ে চলে। এতদিনে একবারও তার দিকে তাকায়নি। সেই নারী অবাক হলেন। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার দিকে তাকান না কেন?

তার ওই কলিগ উত্তর দিলেন, আমি মুসলিম। ইসলাম আমাকে বলে দিয়েছে, কোনো নারী যদি সামনে পড়ে, তোমার দৃষ্টিকে হেফাজত করো। দৃষ্টিকে নত করো। আর তাদের সাথে যদি কথা বলার প্রয়োজন হয়, সম্মানের সাথে কথা বলো। মুসলিম পুরুষের এমন লজ্জাশীল আচরণ দেখে সেই নারী ইসলাম গ্রহণ করেন। এখন তিনি নিয়মিত ইসলাম অনুশীলনসহ বেশ ভালোভাবে ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

আপনি যা বলবেন, পরিবেশ খেয়াল করে বুঝেশুনে বলুন। এমন কোনো কথা বলবেন না, যা শুনতে খারাপ লাগে এবং এর মধ্যে অশ্লীলতা আছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয়ে কখনোই খোলামেলা আলোচনা করেননি। আল্লাহ বলেন—যখন তারা হুজরা থেকে বের হয়; ভেতরে কী কী করে, কী কী হয়, সেটা তিনি বলেননি। আল্লাহ বলেন—যখন তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করো, স্বামী কিন্তু স্ত্রীদের কেবল স্পর্শই করে না। আল্লাহ এসব ব্যাপার খোলামেলা আলোচনা না করার জন্য এমন প্রতীকী কথা বলে এর প্রতি নিরুৎসাহিত করেছেন।

এসব বিষয় আমরা যত বেশি খোলামেলা আলোচনা করব, অশ্লীলতার প্রচার তত বেশি হবে। অশ্লীলতা থামানোর জন্য এর প্রচার করতে হয় না, সেগুলোর কথা বিস্তারিত উল্লেখ করতে হয় না। যখন আপনি বিস্তারিত উল্লেখ করবেন, তখন 'লজ্জাশীল' গুণটির কথা আপনি ভুলে গেলেন। নবিজি বা সাহাবিগণ এই ধরনের কথা আকার-ইঙ্গিতে বলেছেন, বিস্তারিত বলেননি।

একবার জনৈক মহিলা নবিজির কাছে গিয়ে হায়েজের গোসল সম্পর্কে মাসয়ালা জানতে চান। রাসূলুল্লাহ গোসলের নিয়ম বলে দেন—এক টুকরো কস্তুরী লাগানো নেকড়া দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করো। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে পবিত্রতা হাসিল করব? নবিজিকে একই প্রশ্ন তিনবার করা হলে প্রত্যেকবার তিনি একই উত্তর দেন। অতঃপর আয়িশা (রা.) মহিলাকে ডেকে নিয়ে বিস্তারিত বলেন।[১৪১]

নবিজি কিছু শব্দ উহ্য রেখে তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মহিলা বুঝলেন না। ফলে আয়িশা (রা.) তাকে ব্যাপারটি বিস্তারিত বুঝিয়ে দেন। এ থেকে রাসূলুল্লাহর লজ্জাবোধের বিষয়টিও বোঝা যায়।

আপনি কীভাবে, কী রকম পোশাক পরছেন, তা থেকে আপনার লজ্জাবোধ সম্পর্কে অনুমান করা। আপনি কতটা ভদ্র-শালীন সেটা বোঝার প্রথম লক্ষণ

---

[১৪১] সহিহ বুখারি : ৩১৪

হলো, আপনি কেমন পোশাক পরেছেন। নারী ও পুরুষ কেমন পোশাক পরবে এ নিয়ে ইসলামের নির্দেশনা দেওয়া আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

> 'হে বনি আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং সৌন্দর্যস্বরূপ প্রকাশ করবে। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। এগুলো আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[১৪২]

আল্লাহর সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাতের মধ্যে আমরাই একমাত্র প্রাণী, যারা পোশাক পরি। মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে এ নিয়ম নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য একে বিধান করে পাঠিয়েছেন লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য। আর এই পোশাকই যদি লজ্জাস্থান ঢাকতে না পারে, তাহলে পোশাকের কোনো মূল্য নেই।

মা-বোনদের নিকট আমার অনুরোধ। আল্লাহ আপনাদের এমন কিছু দান করেছেন, যা আমাদের দান করেননি। আপনাদের যে সক্ষমতা দান করা হয়েছে, দায়িত্বও আপনাদের অনেক বেশি। যখন লজ্জাশীল আচরণ করবেন, তখন কোটি কোটি টাকার কসমেটিক্স শিল্পকে আপনি তোয়াক্কা করছেন না; এড়িয়ে চলছেন, অশ্লীলতাকে 'না' বলছেন।

তবে সবকিছুতেই আবার লজ্জাশীলতাকে প্রাধান্য দেবেন না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা শোভা পায় না। যেমন : দ্বীনি ইলম বা যেকোনো জ্ঞানের ব্যাপারে কোনো কিছু জানা। একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনি বিস্তারিত জানেন না, জানার আগ্রহবোধ করছেন এবং দরকারও; কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা পাচ্ছেন, সংকোচবোধ করছেন। তার মানে এই না, লজ্জার কারণে তা জানতে চাইবেন না; বরং লজ্জা ভেঙে ভদ্রভাবে যা যা জানা দরকার জিজ্ঞেস করবেন। এই সম্পর্কিত নবিজির একটি হাদিস দিয়েই আলোচনার ইতি টানছি। হাদিসটি আমাদের মুখস্থ রাখা উচিত। নবিজি বলেন, প্রতিটি ধর্মের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আর ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জাশীলতা।[১৪৩]

---

[১৪২] সূরা আরাফ : ২৬

[১৪৩] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৮১

দয়া ও কোমলতা

মুমিনের একটি গুণ হলো দয়াশীলতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এই গুণটি ছিল। আল্লাহ এই গুণের প্রশংসা করে পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।'[১৪৪]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

> 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদের পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।'[১৪৫]

মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হলো মুমিন কোমল হৃদয়ের অধিকারী হবে। সে মানুষের প্রতি দয়া দেখাবে। মানুষের কষ্ট দেখে সে কষ্ট পাবে। মুহাদ্দিসগণ একটি হাদিসকে খুব গুরুত্ব দেন। শিক্ষার্থীরা হাদিস শেখা শুরু করে এই হাদিসটির মাধ্যমে। নবিজি বলেন, আল্লাহ দয়ালুদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। যারা জমিনে বসবাস করছে, তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। দয়া রহমান হতে উদ্‌গত। যে লোক দয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে, আল্লাহ তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[১৪৬]

হাসান (রা.) ছিলেন নবিজির আদরের নাতি, ফাতিমা (রা.)-এর পুত্র। জনসম্মুখে নবিজি একদিন হাসান (রা.)-কে চুমো দিলেন। যেখানে একসময় বাবারা নিজেদের মেয়েদের জীবন্ত কবর দিত, সেই সমাজে নবিজি লোকজনের সামনে তাঁর নাতিকে চুমো খাচ্ছেন? সন্তানকে আদর-স্নেহ তো মানুষ ঘরের মধ্যে করে। ঘরের বাইরে কি কেউ সন্তানকে এভাবে চুমো খায়?

---

[১৪৪] সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

[১৪৫] সূরা আত-তাওবা : ১২৮

[১৪৬] জামে আত-তিরমিজি : ১৯২৪

আকরা ইবনে হারিস (রা.) নামের এক সাহাবি দৃশ্যটি দেখে দারুণ বিস্মিত হলেন। তিনি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাসই করাতে পারছিলেন না। এ রকম একটা সমাজে নবিজি সবার সামনে তাঁর নাতিকে চুমো দিলেন, ব্যাপারটা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। বাচ্চাকে চুমো দেওয়া তাঁর কাছে কেমন যেন দুর্বলতা-দুর্বলতা আর হীনম্মন্য বলে মনে হচ্ছে।

তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমারও তো দশটা ছেলে আছে। কই, আমি তো কোনো দিন কাউকে চুমো দিইনি!

সন্তানকে চুমো না দেওয়া যেন খুব গর্বের কথা! তাঁর এ কথা শুনে নবিজি বললেন—মাল্লা ইয়ারহামু, লা ইয়োরহাম—যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।[১৪৭] মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অন্যের প্রতি দয়া দেখানো। মুমিন আল্লাহর কাছে যেমন দয়াপ্রার্থী, তেমনই মানুষের প্রতিও সে দয়া দেখাবে; কেউ কারও প্রতি দয়া করলে আল্লাহও তাকে দয়া করেন।

নবিজির জীবনে এমন অসংখ্য উদাহরণ দেখা যায়। দ্বীন পালন করা যেন কঠিন হয়ে না পড়ে, এজন্য তিনি অনেক ব্যাপারে জোরারোপ করেননি। তিনি সব সময়ই চেয়েছেন, মানুষ সহজে দ্বীনের মাঝে পা বন্দি হোক আর তা পালন করুক।

মিরাজের রাতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর ওপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। মুসা (আ.) নবিজিকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, এত বেশি নামাজ আপনার উম্মত আদায় করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ উম্মতের কথা চিন্তা করে, ভেবে আল্লাহর কাছে যান নামাজের ওয়াক্ত কমাতে। এভাবে তিনি আল্লাহর কাছে যান নয়বার। প্রতিবারই আল্লাহ নামাজের ওয়াক্ত কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত ৫০ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেন।[১৪৮]

নবিজি বলেন, আমার উম্মাহর জন্য যদি কঠিন না মনে করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাজের আগে তাদের মিসওয়াক করার হুকুম করতাম।[১৪৯]

যদি এমন হতো—প্রত্যেক নামাজের আগে মিসওয়াক করা আবশ্যক, তাহলে আমাদের জন্য তা কষ্টকর হয়ে যেত। আমাদের কষ্টের হওয়ার কথা ভেবে নবিজি প্রত্যেক নামাজের আগে মিসওয়াক করার নির্দেশ দেননি। কোনোভাবে যেন শরিয়াহ কঠিন হয়ে না যায়, সেদিকে তিনি লক্ষ রাখেন। রাসূলুল্লাহ আরও

---

[১৪৭] সহিহ বুখারি : ৫৯৯৭
[১৪৮] সহিহ বুখারি : ৩৪৯
[১৪৯] সহিহ বুখারি : ৮৮৭

বলেন, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে তাদের বিলম্বে এশার নামাজ পড়তে নির্দেশ দিতাম।[১৫০]

এখন আমরা এশার নামাজ পড়ি রাত আটটায়। শীতকালে সাতটার সময়। যদি এমন হতো—এশার নামাজ রাত বারোটায় পড়া নিয়ম, তাহলে আমাদের জন্য এটা ব্যাপক কষ্টকর হতো। এশা ও ফজর এই দুই নামাজের চিন্তায় ভালোমতো ঘুম হতো না। নবিজি আমাদের কষ্টের কথা ভেবে এমন আদেশ দেননি।

তারাবির ক্ষেত্রেও দেখা যায় নবিজি একটানা তিন দিন মসজিদে যান, তারাবির নামাজ আদায় করেন। কিন্তু চতুর্থ দিন মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। যথা দিনের মতো সাহাবিরা নবিজি মসজিদে আসার অপেক্ষায় বসে রইলেন। রাসূলুল্লাহ বলেন—শোনো, আমি জানতাম তোমরা সারারাত ধরে এখানে আছ, কিন্তু আমি আসিনি। এই নামাজ তোমাদের ওপর 'ফরজ' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি (বিধায় হুজরা থেকে বের হইনি)। এমন হতে পারে, তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়তে পারো।[১৫১]

একবার নবিজি মসজিদে নববিতে বসে আছেন। এমন সময় এক বেদুইন এমন সময় প্রবেশ করল। বেদুইনরা সাধারণত শহরতলীর বাইরে থাকত, তাই শহুরে আদব-কায়দার সাথে তারা তেমন পরিচিত ছিল না। তাদের স্বভাবও অনেকটা রূঢ়-রুক্ষ ছিল। কিছুক্ষণ পর বেদুইনটি মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে পেশাব করা শুরু করল। যেখানে নবিজি নিজে বসে আছেন, যে মসজিদটি তিনি নিজ হাতে নির্মাণ করেছেন, সেই মসজিদেই কিনা কোথাকার এক বেদুইন এসে পেশাব করা শুরু করল?

সাহাবিরা তো রাগে অগ্নিশর্মা। তেড়ে গেলেন বেদুইনকে শায়েস্তা করতে। এমতাবস্থায় যদিও তাদের রাগ করাটা খুবই যৌক্তিক এবং স্বাভাবিক ছিল। একে তো বেদুইন, আবার মসজিদে ঢুকে তাদেরই বিরুদ্ধে দুআ করেছে, তার ওপর নবিজি উপস্থিতিতে এমন গর্হিত কাজ শুরু করল। এর শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাহাবিদের থামালেন। তিনি বললেন—থামো, থামো। তোমরা তাকে বাধা দিয়ো না, ছেড়ে দাও।

নবিজি বেদুইনকে শান্তিমতো পেশাব করতে দিলেন। নিজে যেমন বাধা দিলেন না, তেমনই সাহাবিরা বাধা দিতে গেলে; বরং তাঁদেরও বাধা দিতে নিষেধ করলেন। কারণ, এমন অবস্থায় তার পেশাব আটকালে তার শারীরিক সমস্যা

---

[১৫০] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৬৯০

[১৫১] সহিহ বুখারি : ২০১২

হতে পারে। পেশাব আটকে যেতে পারে। মৃত্যুও হতে পারে। ধীরে-সুস্থে পেশাব করা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ তাকে ডেকে বোঝালেন, এটা হলো মসজিদ। এখানে প্রসাব করা বা ময়লা আবর্জনা ফেলা যায় না; এটি আল্লাহর জিকির, নামাজ পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জায়গা।[১৫২]

নবিজি ধরে নিলেন, বেদুইনটি মসজিদের আদব সম্পর্কে জানে না। সে মসজিদকে অন্য দশ জায়গার মতো ভেবেছে। তাকে ডেকে শাস্তি না দিয়ে উলটো জ্ঞানদান করলেন। পুরো বিষয়টি বোঝানোর পর নবিজি চাইলে তাকে বলতে পারতেন—তুমি যে ভুলটা করেছ, এখন সেটার প্রায়শ্চিত্ত করো। যেখানে পেশাব করেছ, পানি দিয়ে ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করে দাও।

নবিজি তা-ও করেননি। তিনি কী করলেন? সাহাবিদের, যারা বেদুইনের এহেন কাণ্ড দেখে বিরক্ত, রাগান্বিত, তাদের বললেন—পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।

নবিজি সাহাবিদের এই ঘটনার মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। এত কিছুর পরও রাসূলুল্লাহ বেদুইনকে বকাঝকা না করে, তার প্রতি কঠোর আচরণ না করে উলটো সাহাবিদের বলছেন, তোমাদের কোমল ও সুন্দর আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে; রুক্ষ-রূঢ়, কঠোর আচরণের জন্য পাঠানো হয়নি।[১৫৩]

বেদুইন লোকটি সাহাবিদের আচরণ খেয়াল করেন, অন্যদিকে নবিজির কোমল আচরণও দেখেন। ফলে তিনি সাহাবিদের জন্য দুআ না করে কেবল রাসূলুল্লাহর জন্য দুআ করেন, হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া করো ও মুহাম্মাদের প্রতি দয়া করো। এ ছাড়া আর কারও প্রতি দয়া করো না!

বেদুইনের এমন অদ্ভুত দুআ থেকেই বোঝা যায়, তিনি বাকিদের ওপর কতটা বিরক্ত আর অসন্তুষ্ট ছিলেন। নবিজি তাকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন, তুমি ব্যাপকতাকে সীমিত করে দিলে।[১৫৪]

একবার এক যুবক সাহাবি নবিজির কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে জিনা করার অনুমতি দিন!

ওই যুবক সাহাবি নবিজির এমন কোনো বন্ধু নন, মন চাইল, ইচ্ছে হলো—নবিজির কাছে প্রকাশ করে দেবেন। তা-ও আবার তিনি সাহাবিদের নিয়ে তখন

---

[১৫২] সহিহ মুসলিম : ৫৪৮

[১৫৩] সহিহ বুখারি : ২২০

[১৫৪] সুনানে আবু দাউদ : ৩৮০

মজলিসে বসা। সাহাবিরা তাকে ধমক দিলেন—থামো, থামো। তাঁরা এমনটাই বোঝাতে চাইলেন, তোমার এত্ত বড়ো সাহস? এসব তুমি কী বলছ?

ভাবা যায়, ওই যুবক সাহাবি নবিজিকে কতটা 'আপন মানুষ' হিসেবে চিন্তা করেছেন? নিজের এমন ইচ্ছে আর খাহেশাতের কথাও তিনি নবিজির কাছে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন। এমন কথা তো এক বন্ধুও তার অন্য বন্ধুকে বলে না।

নবিজি তাকে কাছে ডাকলেন, এখানে এসো। খেয়াল করুন, সাহাবিরা তাকে ধমক দিলেন আর নবিজি তাকে কাছে যেতে বললেন। এখন কি তিনি সজোরে তার গালে দুটি চড় মারবেন? কিংবা সাহাবিদের বলবেন—একে ধরো, বেঁধে রাখো। শাস্তি দিয়ে দেখিয়ে দাও, এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কেউ করতে চাইলে কী পরিণতি হয়।

না, নবিজি এর কোনোটাই করলেন না। আচ্ছা, ঠিক এই মুহূর্তে একটু ভাবুন তো—আপনি সাহস করে আপনার শিক্ষককে সবার সামনে তার মেয়ের সাথে প্রেম/বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবেন!

দেখুন, নবিজি কতটা সচেতনভাবে প্রশ্নের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি কোনো প্রকার বাজে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে স্বাভাবিক থাকলেন এবং তাকে পালটা প্রশ্ন করলেন—তুমি কি নিজের মায়ের জন্য এমনটা করতে পছন্দ করো, তুমি কি চাও অবৈধভাবে কেউ তার সাথে এটা করুক? সাহাবি উত্তরে বললেন—তিনি এটা পছন্দ করেন না, চান না। অতঃপর নবিজি তাকে বোঝালেন—তুমি যার সাথে এমনটা করবে, সে-ও তো কারও না কারোর মা।

এবার নবিজি আবার জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি চাও তোমার মেয়ের সাথে এমনটা হোক, সেটা তুমি পছন্দ করো? যুবক সাহাবি আবারও উত্তর দিলেন—না। নবিজি এবারও বোঝালেন, তুমি যার সাথে এমনটা করবে, সে-ও তো কারও না কারোর মেয়ে।

এভাবে নবিজি একে একে বোন, ফুফু, খালার উদাহরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করে সমাধান দিলেন—তুমি যার সাথেই এমনটা করো না কেন, সে কারও না কারও মা, বোন, মেয়ে, খালা, ফুফু কিংবা রক্তের সম্পর্কের। তুমি যেমন নিজের কারও সাথে এমনটা হোক চাও না, তেমনই তারাও তো এমনটা চায় না।

কথাগুলো বলার পর নবিজির হাত যুবকের বুকে রাখলেন। এই অনুভূতিটাও খানিক চিন্তা করুন তো। যে কিনা জিনার মতো বড়ো পাপ কাজের অনুমতি প্রার্থনার জন্য নবিজির কাছে এসেছিল। আর তাকে বোঝানোর শেষে আবার

নবিজি নিজেই তা বুকে হাত রাখছেন। চিন্তা করুন—নবিজি সেই হাত আমার-আপনার বুকে রাখছেন! কারণ, ওই যুবকের মতো অনুভূতি তো আমাদের প্রত্যেকেরই হয়। কখনো কখনো বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বসলে এসব আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করি, নতুবা গোপন রাখি, ছাপিয়ে যাই।

নবিজি যুবকের বুকে হাত রেখে দুআ করলেন—হে আল্লাহ! আপনি তার গুনাহগুলো মাফ করে দিন, তার হৃদয়কে পবিত্র করে দিন এবং তাকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করুন।[১৫৫]

সেদিনের পর থেকে ওই যুবক সাহাবি আর কোনো দিন জিনার দিকে ঝোঁকেননি। নবিজি যে তাকে বুঝিয়েছিলেন, সেটা তার কতটা কাজে লেগেছিল এবং প্রভাবিত করেছিল। একবার ভাবুন, তিনি জিনা করার কথা মাথা থেকে একেবারেই বাদ দিয়ে দেন।

নবিজি কেবল মুসলিমদের দয়া দেখাতেন না। তাঁর সাথে শত্রুতা করত, এমন অমুসলিমদের প্রতিও তিনি দয়াশীল ছিলেন। এক ইহুদি বালক ছিল রাসূলুল্লাহর খাদেম। সে একবার গুরতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। নবিজি সাহাবিদের সাথে নিয়ে তাকে দেখতে গেলেন। অসুস্থ ইহুদি বালকের মাথার পাশে বসলেন এবং তার মাথায় হাত রাখলেন।

সে প্রায় সময় নবিজির খেদমত করত। যার ফলে তার প্রতি নবিজির একধরনের মমতাবোধ জন্মে। তিনি বুঝতে পারলেন ছেলেটি মৃত্যুশয্যায়। বেশিক্ষণ হয়তো বাঁচবে না।

নবিজি তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। ইহুদি বালকের সামনে উপস্থিত ছিলেন তার পিতা। যে ছেলে সারাজীবন ইহুদি ছিল, এখন মৃত্যুর আগে পিতার সামনে পিতৃধর্ম পরিবর্তন করবে, কীভাবে সম্ভব?

নবিজি তাঁর ব্যবহারের মাধ্যমে কত মানুষের মন জয় করেছিলেন। এখন আবার তিনি একজন ইহুদির ঘরে গিয়ে তার ছেলেকে ধর্ম পরিবর্তন করতে বলছেন। স্বাভাবিকভাবে ইহুদি তো তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা! কিন্তু না। সেই ইহুদি ব্যক্তিটি নিজেই তার ছেলেকে বলছে, আবুল কাসিমের (নবিজির কুনিয়াত) কথা মেনে নাও।

বাবার কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে ছেলে ইসলাম গ্রহণ করল এবং কিছুক্ষণ পর ছেলেটি ইন্তেকাল করল। নবিজি ইহুদির ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বললেন, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তাকে (বালকটিকে) জাহান্নাম হতে মুক্তি দিলেন।[১৫৬]

---

[১৫৫] মুসনাদে আহমাদ : ২২২১১

একবার নবিজি সাহাবিদের সঙ্গে বসা ছিলেন। এই সময়ে একটি লাশ তাঁদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি সাহাবিরাও দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবিরা বুঝতে পারলেন, লাশটি একজন ইহুদির। তাঁরা নবিজিকে বললেন, এটা তো একজন ইহুদির লাশ? আপনি ইহুদির লাশের জন্য দাঁড়ালেন? নবিজি বললেন, (তাতে কী?) সে কি মানুষ নয়?[১৫৭]

মনে করুন, আমরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। দেখতে পেলাম, মানুষজন লাশ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হোক সেটা মুসলিম কিংবা অমুসলিমের লাশ। আমাদের উচিত—একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের সুযোগ করে দেওয়া; যেন লাশ নিয়ে তারা সহজে যেতে পারে।

নবিজির দয়ার কারণে তায়েফ শহরটি আজও ঠিকে আছে। নতুবা যেদিন তায়েফের লোকজন তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল, আল্লাহ সেদিন সেই শহর একেবারেই ধ্বংস করে দিতেন। জিবরাইল (আ.) নবিজিকে বলেন, আপনার কওম আপনাকে যা যা বলেছে তা আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছা তা-ই হুকুম দিতে পারেন।

পাহাড়ের ফেরেশতা এসে নবিজিকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এই ব্যাপারটি একান্তই আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। আপনি যদি চান তাহলে আমি তাদের ওপর দুটি কঠিন শিলা-পাহাড় চাপিয়ে দেবো।

এই তো প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে যারা নবিজিকে রক্তাক্ত করে তাদের শহর থেকে বের করে দিয়েছে, এখন নবিজি চাইলে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারেন। আল্লাহ নিজেই ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁকে সাহায্য করছেন। কিন্তু জবাবে রহমাতুল্লিল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—না; বরং আমি আশা করি—আল্লাহ তাঁদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন, যারা আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।[১৫৮]

কাফিররা নবিজিকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে। অন্যদিকে কপোল বেয়ে পড়া রক্ত তিনি মুছতে থাকেন আর বলেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন; যেহেতু তারা জানে না।[১৫৯]

---

[১৫৬] সহিহ বুখারি : ১৩৫৬

[১৫৭] সহিহ বুখারি : ১৩১২

[১৫৮] সহিহ বুখারি : ৩২৩১

[১৫৯] সহিহ বুখারি : ৩৪৭৭

নবিজি কেবল মানুষের প্রতিই দয়াশীল ছিলেন না, তিনি পশু-প্রাণীদের প্রতিও দয়াশীল ছিলেন। একবার তিনি জনৈক আনসারি সাহাবির খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। একটি উটের দিকে চোখ পড়তেই তিনি খেয়াল করেন, উটটি তাঁকে দেখে কাঁদতে শুরু করেছে। নবিজি উটের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেন, আর উটটি কান্না থামিয়ে দেয়।

নবিজি জানতে চাইলেন, এই উটের মালিক কে?

উটের মালিক ছিল এক আনসারি যুবক। সে নবিজির কাছে এলে তিনি তাকে বললেন—আল্লাহ যে তোমাকে এই নিরীহ প্রাণীটির মালিক বানালেন, এর অধিকারের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না? উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি একে ক্ষুধার্ত রাখো এবং কষ্ট দাও।[১৬০]

নবিজি আবার জীবের প্রতিই একপেশেভাবে দয়া করেননি, তিনি জড়পদার্থের প্রতিও দয়া দেখিয়েছেন।

মসজিদে নববিতে একটি খেজুরগাছের মিম্বর ছিল। যেখানে দাঁড়িয়ে নবিজি খুতবা দিতেন। নতুন মিম্বর আসার পর সেখান থেকে পুরোনো মিম্বরটি সরিয়ে রাখা হয়। কিছুক্ষণ বাদে শোনা যায় ওই খেজুরগাছের কাণ্ডটি কান্না করছে! সাহাবিরাও কান্না শুনতে পান। নবিজি নতুন মিম্বর থেকে নেমে খেজুর কাণ্ডের ওপর হাত রাখেন এবং জড়িয়ে ধরেন। অবশেষে সেটা কান্না থামায়![১৬১]

এই ঘটনা বর্ণনা করে হাসান আল বসরি (রহ.) বলেন—এমনকি একটি খেজুরের কাণ্ড পর্যন্ত রাসূলের বিচ্ছেদে কান্না করেছে, আমরা কি তাঁর বিচ্ছেদে কান্না করব না?

ইসলামি শরিয়াহ আমাদের বলে অন্যের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে। সে হোক মুসলিম-অমুসলিম কিংবা অন্য কোনো প্রাণী। আপনার প্রতিবেশী কোনো অমুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়লে, বিপদে পড়লে তাকেও সহযোগিতা করতে হবে। যেকোনো বিপদে তার পাশে দাঁড়াতে হবে। একইভাবে গৃহপালিত প্রাণীর প্রতিও দয়া প্রদর্শনসহ তাদের ঠিকমতো পরিচর্যা করতে হবে এবং খাবার দিতে হবে।

এখনকার সময়ে কেউ কেউ বলে থাকে—মুমিন কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না, মুমিনকে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতে হয়। এটা ভুল কথা, অবশ্যই এটা ভুল কথা। যখন যেখানে কঠোর হওয়া দরকার, আমরা কঠোর হব। কিন্তু

---

[১৬০] সুনানে আবু দাউদ : ২৫৪৯

[১৬১] সহিহ বুখারি : ২০৯৫

আমাদের স্বভাবত গুণ হওয়া উচিত কোমলপ্রাণ। মুমিনের স্বভাবজাত গুণই হলো কোমলতা; কখনোই কঠোরতা নয়। প্রয়োজনসাপেক্ষে আমরা কঠোর হব, কিন্তু আমাদের সার্বক্ষণিক আচরণ হবে নরম-কোমল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।'[১৬২]

আল্লাহ হলেন রহিম-রহমান, তিনি তাঁর রাসূলকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ নিজে দয়ালু, তিনি দয়াশীলতা পছন্দ করেন। আমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ পেতে চাই, আমাদেরও মানবজাতির প্রতি দয়াশীল আচরণ করতে হবে।

---

[১৬২] সূরা আম্বিয়া : ১০৭

কৃতজ্ঞতাবোধ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।'[১৬৩]

এই গুণটি মুমিনের অন্যতম একটি গুণ। একজন মুমিন স্বভাবতই সব সময় কৃতজ্ঞ থাকে। সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা তার সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ায় তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। কিন্তু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাঁর খুব কমসংখ্যক বান্দাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, হাত-পা-চোখ দান করেছেন, রিজিক দেন, সেই আল্লাহর প্রতি মানুষ কীভাবে অকৃতজ্ঞ হতে পারে?

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন—

> 'অবশ্যই আমি তাকে পথপ্রদর্শন করেছি। হয় সে কৃতজ্ঞ, না হয় অকৃতজ্ঞ।'[১৬৪]

কৃতজ্ঞতার আরবি হলো 'শুকুর' বিপরীত দিকে অকৃতজ্ঞতার আরবি হলো 'কুফর'। আল্লাহকে অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা যেমন কুফর; তেমনই আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা বোঝাতেও কুফর শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আমাদের সামনে উন্মুক্ত পথ। হয় আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হব, নতুবা তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকব।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) একবার শুনলেন, এক লোক দুআ করছে, হে আল্লাহ! আমাকে অল্পসংখ্যকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন! উমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অল্পসংখ্যক মানে কী? কারা অল্পসংখ্যক? তখন লোকটি খলিফাকে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান—

'আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।'[১৬৫]

---

[১৬৩] সূরা সাবা : ১৩

[১৬৪] সূরা দাহর : ৩

[১৬৫] সূরা সাবা : ১৩

লোকটির বুদ্ধিমত্তা দেখে খলিফা বললেন, সবাই আমার চেয়ে কত বেশি জানে![১৬৬]

কৃতজ্ঞতাবোধের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা যে শুধু আল্লাহর প্রতিই কৃতজ্ঞতা আদায় করব, এমন না। মানুষের প্রতিও আমাদের এ বোধ থাকবে। যদি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতার হক আদায় করতে পারি, তাহলে আল্লাহর প্রতিও আমরা আদায় করতে পারব। যে পারে, সে দুটিই পারে। যে পারে না, সে একটিও পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[১৬৭]

একই হাদিসে নবিজি আরও বলেন—যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।[১৬৮] আপনি যদি আল্লাহর ইবাদত একাগ্রতার সহিতও করেন, কিন্তু বান্দার হক পরিপূর্ণভাবে আদায় না করতে পারেন, মানুষকে কষ্ট দেন; তাহলে এর জন্য পরকালে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। রাসূলুল্লাহর আরেকটি হাদিস থেকে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়।

জনৈক সাহাবি একবার নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক নারী অত্যধিক নামাজ-রোজা ও দানের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু সে কথার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীকে আঘাক করে, কষ্ট দেয়। তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন? রাসূলুল্লাহ বললেন, সে জাহান্নামি।

সাহাবি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরেকজন নারী কম রোজা রাখে, দানও কম করে এবং নামাজও কম পড়ার ব্যাপারে লোকসমাজে সে প্রসিদ্ধ। বলতে গেলে এক টুকরো পনিরই দান করে। কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না, তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন? নবিজি বললেন, সে জান্নাতি।[১৬৯]

একজন মানুষ কীভাবে নিজেকে আল্লাহর ওলি দাবি করতে পারে? যে কিনা নিয়মিত নামাজ পড়ে, অথচ মানুষের সাথে প্রতারণা করে, কষ্ট দেয়—এমন একজন মানুষ কি ওলি হতে পারে? আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য তো অবশ্যই 'অলরাউন্ডার' হতে হবে। ইবাদত যেমন করতে হবে, পাশাপাশি মানুষের হকও আদায় করতে হবে, যা আদায় করা সম্ভব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে। কৃতজ্ঞতা মূলত তিন প্রকার। সেগুলো হলো—

---

[১৬৬] *মুসান্নাফে আবি শায়বা* : ২৯৫১৪

[১৬৭] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮১১

[১৬৮] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮১১

[১৬৯] মুসনাদে আহমাদ : ৯২৯৮

ক. অন্তর।

খ. জবান ও

গ. আমলের কৃতজ্ঞতা।

অন্তরের কৃতজ্ঞতা

অন্তরের কৃতজ্ঞতা আদায় হয় উপলব্ধির মাধ্যমে। আল্লাহ আপনাকে কেমন নিয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করেছেন? কীভাবে মানুষ আপনাকে উপকার করেছে বিপদ-আপদ ও সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়িয়েছে? আপনি যখন এসব উপকারের কথা অনুভব করবেন, আপনা-আপনিই সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ইচ্ছে হবে। আর খুব সহজেই এর হক আদায় করতে পারবেন।

আপনি যদি মা অথবা বাবা হয়ে থাকেন, এ কথাটা অনুভব করতে পারবেন, সুবহানাল্লাহ! আমার মা-বাবা আমার জন্য কত কিছুই-না করেছেন। বাবা-মা হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি হয়তো এভাবে অনুভব করতে পারবেন না, তাঁরা আপনার জন্য কী কী করেছেন। নিজের সন্তানকে বুকে নিয়ে যখন আদর করতে যাবেন, মনে পড়বে—শৈশবের কথা। সন্তানের মাঝে শৈশবের সেই 'আপনি'র ছায়া খুঁজে পাবেন।

জবানের কৃতজ্ঞতা

আপনি যদি অনুভব করেন—কেউ আপনার উপকার করেছে, তাকে কৃতজ্ঞতা জানান। তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আল্লাহ আপনাকে অনেক কিছু দান করেছেন, নিয়মিত আলহামদুলিল্লাহ বলুন।

অনেকেই আছেন, যারা নিয়মিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলেও মানুষের ব্যাপারে অতটা সচেতন না। তারা মনে করেন—আমার বন্ধু, ভাই বা আব্বা-আম্মাকে ধন্যবাদ, জাজাকাল্লাহ বলে কী হবে? তারা তো আমারই আপনজন। আপনজনের সাথে আবার ফর্মালিটি কীসের?

এটা ভুল ধারণা। মানুষ স্বভাবতই নিজের পক্ষে প্রশংসা শুনতে পছন্দ করে, সে চায় তার প্রতি কেউ কৃতজ্ঞতা আদায় করুক—এটা তার ভালো লাগে। রিকশা থেকে নেমে একদিন রিকশাওয়ালাকে বলে দেখুন, শুকরিয়া/ধন্যবাদ মামা কিংবা জাজাকাল্লাহু খাইরান মামা। দেখবেন, সেই রিকশাওয়ালা আপনাকে সুন্দর একটি হাসি উপহার দেবেন। কারণ, এভাবে তাকে কেউই কখনো বলে না। এই ধরনের কথা শুনে তিনি অভ্যস্ত নন। যখন আপনার মুখ থেকে শুনবেন, আপনাকে পছন্দ করবেন; মনে মনে হয়তো আপনার জন্য তিনি দুআও করতে পারেন।

ঈদের সময় আপনার বাবা আপনাকে নতুন জামা কিনে দেন। তিনি কিন্তু আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ/জাজাকাল্লাহ শোনার জন্য তা করেন না। এখন যদি আপনি বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তিনি খুব খুশি হবেন। সামান্য একটি বাক্য দিয়ে যদি আপনি মানুষকে খুশি করতে পারেন, মানুষের মন জয় করে নিতে পারেন, তাহলে এটা বলতে আপনার আপত্তি কোথায়?

আমলের কৃতজ্ঞতা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—'হে দাউদ পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করে যাও।'[১৭০]

দাউদ (আ.) এত লম্বা নামাজ পড়তেন, নবিজি তাঁর নামাজের প্রশংসা করেন। দাউদ (আ.) এত বেশি রোজা রাখতেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর রোজা রাখার প্রশংসা করেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে দাউদ (আ.) ও তাঁর পরিবারকে জানিয়ে দেন, তারা যেন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁকে যে নিয়ামত দান করেন, সেগুলোর তিনি সদ্ব্যবহার করবেন। আর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবেন। নবিজি বলেন, কাউকে অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে—জাজাকাল্লাহু খাইরান অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা আদায় করল।[১৭১]

কেউ আমাদের কোনো উপকার করল, আর ওই উপকারের প্রতিদান দিতে কোনোভাবেই দিতে পারছি না, তাহলে আমরা যেন কথার মাধ্যমে অন্তত তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এ প্রসঙ্গে নবিজি বলেন, কাউকে কিছু দান করা হলে, যদি তার সক্ষমতা থাকে সে যেন তার প্রতিদান দেয়। সক্ষমতা না থাকলে, সে যেন প্রশংসা করে। কেননা, যে লোক প্রশংসা করল, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যে তা গোপন রাখল, সে অকৃতজ্ঞ হলো।[১৭২]

দুঃখজনক যে, আমাদের পরিবারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না। কাছের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না। পরিবারের গৃহিণী যখন ভালো রান্না করে, মুখ ফুটে বলি না—রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে, আল্লাহ তোমার/আপনার হাতে বরকত দান করুন। লজ্জা পাই কিংবা মনে করি, বলে কী হবে?

আমরা কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। শুধু কাজের মাধ্যমেই প্রকাশ করতে হবে, এমন না। কথার মাধ্যমেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। আপনার

---

[১৭০] সূরা সাবা : ১৩

[১৭১] জামে আত-তিরমিজি : ২০৩৫

[১৭২] জামে আত-তিরমিজি : ২০৩৪

ছোট্ট একটি প্রশংসা অনেকের সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে দিতে পারে। নবিজি তাঁর পরিবার থেকে শুরু করে সাহাবিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। এ ব্যাপারে তিনি কখনোই কার্পণ্য করতেন না; আমরাও যেন কার্পণ্য না করি।

অনেকেই দেখবেন রমজানের শেষে ঈদের রাতে ঈদ মোবারক ম্যাসেজ দেয়। কেউ কেউ সেটা হোয়াটসঅ্যাপে সবাইকে জানিয়ে দেয়, কেউ আবার কপি করে সবাইকে একই ম্যাসেজ পাঠায়। মনে করুন, কেউ আপনাকে কপি-পেস্ট ম্যাসেজ পাঠাল। আরেকজন আপনাকে ফোন করে বলল, ঈদ মোবারক। কোনটা আপনার কাছে বেশি ভালো লাগবে? অবশ্যই, যে আপনাকে ফোন করে বলেছে! কারণ, আপনি তার মধ্যে আন্তরিকতা দেখতে পেয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা আদায় হতে পারে সামান্য কিংবা বড়ো জিনিসের জন্য। যে আপনাকে এক লক্ষ টাকা দিলো, তাকে আপনি 'জাজাকাল্লাহু খাইরান' বললেন। অথচ যে আপনাকে ১০ টাকা দিলো, তাকে জাজাকাল্লাহু খাইরান বললেন না; এমনটা হতে পারে না। নবিজি বলেন, যে ছোটো কিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে বড়ো কিছুর জন্যও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।[১৭৩]

আপনি যদি ছোটো বিপর্যয়ে ধৈর্যধারণ করতে না পারেন, তাহলে বড়ো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে ভেঙে পড়বেন। কৃতজ্ঞতা আদায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এটা অভ্যাসের ব্যাপার, চর্চার ব্যাপার। হুট করেই আপনি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবেন না। ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য শিখতে হবে, অধিক চর্চা করতে হবে।

কেউ যদি আপনাকে হাজার টাকার কোনো উপহার দেয়, আপনি তাকে শ টাকার উপহার দিন। কেউ যদি আপনাকে দুটি বই উপহার দেয়, আপনি তাকে অন্তত একটি বই উপহার দিন। সব সময় অন্যে দেবে, আপনি তার আশায় বসে থাকবেন, এমনটা যেন না হয়।

সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও আপনি অন্যের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। কেউ যদি ১০ বছর পূর্বে আপনার কোনো উপকার করে থাকে, ১০ বছর পরও তার সেই উপকারের কথা স্মরণ করুন। এমনটা ভাববেন না—তখন তো আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করেছিই, এখন আর আদায় করে কী হবে?

নবিজি নিজে পর্যন্ত সাহাবিদের উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন। আপনি-আমি কেন করব না? অথচ সাহাবিরা

---

[১৭৩] *আল ফিরদাউদ লিল-দায়লামি* : ৫৯৬২

তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এসব করতেন। তারপরও নবিজি তাঁদের অবদান স্মরণ করতেন। নবিজি আবু বকর (রা.) সম্পর্কে বলেন, নিজের সম্পদ এবং সাহচর্য দিয়ে যিনি আমার সবচেয়ে বেশি উপকারে এসেছেন, তিনি হলেন—আবু বকর।[১৭৪]

নবিজি ইন্তেকালের কয়েক দিন পূর্বে বলেন, আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। আবু বকরের দরজা ব্যতীত এই মসজিদের ছোটো দরজাগুলো সব বন্ধ করে দাও।[১৭৫]

কয়েক যুগ পর যখন শায়মা (রা.)-এর সাথে নবিজির দেখা হয়, তিনি তখন তাঁর দুধবোনের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। ছোটোবেলায় রাসূলুল্লাহকে লালনপালন করেন উম্মে আইমান (রা.)। নবিজি সারাজীবন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন। তিনি তাঁকে ডাকতেন 'মায়ের পর মা' বলে।

নবিজির জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়ে তাঁর পাশে থাকেন খাদিজা (রা.)। জীবদ্দশায় নবিজি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। ইন্তেকালের পরও তিনি তাঁর কথা প্রবলভাবে স্মরণ করতেন, প্রশংসা করতেন, কৃতজ্ঞ হতেন। কখনো ছাগল জবাই করলে রাসূলুল্লাহ খুঁজে খুঁজে খাদিজা (রা.)-এর বান্ধবীদের কাছে গোশত পাঠাতেন।[১৭৬] খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পরও তাঁর প্রতি নবিজির ভালোবাসা অটুট থাকে।

নবিজি যেমন তাঁর স্ত্রী ও সাহাবিদের উপকারের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, তেমনই অমুসলিমদের কৃতজ্ঞতার কথাও স্মরণ করতেন। তেমনই একজন অমুসলিম ছিলেন মুতইম ইবনে আদি। নবিজি তায়েফ থেকে ফেরার পর মুতইম ইবনে আদি নবিজিকে আশ্রয় দেন। তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও বিভিন্ন সময় মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতেন মানবিক কারণে। তাঁর কারণে নানান সময় মুসলিমরা উপকৃত হতো।

দুঃসময়ে উপকার করা মুতইম ইবনে আদির প্রশংসা নবিজি সাহাবিদের সামনে করেন। নবিজি বলেন, মুতইম যদি তখন বেঁচে থাকতেন আর তাঁকে এ ব্যাপারে সুপারিশ করতেন। ইসলামের সুদিনে 'উপকারী বন্ধু'র প্রতিদানস্বরূপ বদর যুদ্ধের বন্দিদের তিনি মুক্ত করে দিতেন বিনা মুক্তিপণে। নবিজি আরও বলেন, যদি মুতইম ইবনে আদি জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল

---

[১৭৪] সহিহ বুখারি : ৪৬৬
[১৭৫] সহিহ বুখারি : ৪৬৭
[১৭৬] সহিহ বুখারি : ৬০০৪

নোংরা লোকের জন্য সুপারিশ করতেন, তবে আমি তার সম্মানার্থে এদের মুক্ত করে দিতাম।[১৭৭]

আমরা যেন সেই অল্পসংখ্যকদের দলভুক্ত হতে পারি, যে অল্পসংখ্যক লোক আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করে। সুলাইমান (আ.)-এর মতো আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি—

> 'হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি ও আমার মা-বাবার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য আপনার শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক আমাকে দান করুন।'[১৭৮]

[১৭৭] সহিহ বুখারি : ৩১৩৯; মুসনাদে আহমাদ : ২৭৫০৬

[১৭৮] সূরা নামল : ১৯

জবানের হেফাজত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়াবনত আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ।'[১৭৯]

একজন মুমিন অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হয় না। কোথাও অনর্থক কথা হচ্ছে শুনলে সে সেখান থেকে উঠে চলে যায়। বসে বসে কান পেতে এসব শোনে না। সূরা ফুরকানে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তারা বলে—সালাম।'[১৮০]

আল্লাহ জানিয়ে দেন—যারা মুমিন, তারা মূর্খের কথায় কান দেয় না। তারা তাকে উত্তেজিত করতে চাইলেও সে তাদের সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হয় না। সূরা ফুরকানেই কয়েক আয়াত পর আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যখন তারা অনর্থক কথাকর্মের পাশ দিয়ে চলে, তখন তা পরিহার করে চলে।'[১৮১]

মুমিন যখন দেখতে পায় রাস্তার পাশে মানুষজন অন্যের গিবত করছে, হোটেলে বসে আরেক বাড়ির দোষত্রুটি তুলে ধরছে, তখন ওই মজলিসে সে আর বসে না; বরং সেখান থেকে উঠে যায়।

মুমিন কী শুনবে, কী দেখবে এ ব্যাপারে যেমন সচেতন থাকে, তেমনই কোথায় কী বলবে, এ ব্যাপারেও সে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে। কেননা, তার প্রতিটি কথা প্রতি মুহূর্তে ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ করছেন। আল্লাহ বলেন—

> 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ! তারা জানে, তোমরা যা করো।'[১৮২]

---

[১৭৯] সূরা মুমিনুন : ১-৩
[১৮০] সূরা ফুরকান : ৬৩
[১৮১] সূরা ফুরকান : ৭২
[১৮২] সূরা ইনফিতার : ১১-১২

কথা বলার সময় আমরা কী বলছি সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। এর জন্য আমরা নাজাত লাভ করতে পারি আবার আমাদের পাকড়াও করা হতে পারে। একবার নবিজিকে উকবা ইবনে আমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তির উপায় কী? নবিজি তিনটি মুক্তির উপায় বলেন। সেগুলো হলো—

ক. তুমি তোমার জবানের হেফাজত করো।

খ. তোমার বাসস্থান যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় এবং

গ. তোমার গুনাহের জন্য কান্না করো।[১৮৩]

লক্ষ করুন, নবিজি মুক্তির তিনটি উপায়ের মধ্যে প্রথম উপায় বলেন, জবানের হেফাজত।

—আরেকবার মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন একটি আমল আমাকে জানিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে।

—নবিজি তাঁকে উপদেশ দেওয়ার পর বললেন, আমি যা বললাম, সেগুলোর সারসংক্ষেপ বলব?

—মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বললেন, জি, বলুন।

—অতঃপর নবিজি তাঁর জিহ্বা ধরে বললেন, এটা সংযত রাখো।

—মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বেশ অবাক হলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে কথাবার্তা বলি, এগুলোর সম্পর্কেও কি জবাবদিহি করতে হবে?

—নবিজি মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে আরবের প্রচলিত একটি প্রবাদ বললেন, হে মুয়াজ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে কেবল জিহ্বার উপার্জনের কারণেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে![১৮৪]

মানুষ তার জবান দিয়ে মিথ্যা বলে। অন্যকে অপবাদ দেয়। গিবত করে। মানুষকে খোঁটা দেয়। গালাগাল করে। তার জিহ্বার কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অথবা এই জিহ্বার কারণেই সে জান্নাত লাভ করবে। নবিজি বলেন, তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম, তারাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। কিয়ামতের দিন তারা আমার খুব নিকটে থাকবে। (অন্যদিকে) তোমাদের মধ্যে যারা আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য, কিয়ামতের দিন তারা আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হবে এমন—

---

[১৮৩] জামে আত-তিরমিজি : ২৪০৬

[১৮৪] জামে আত-তিরমিজি : ২৬১৬

ক. বাচাল।

খ. ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং

গ. অহংকারে মত্ত ব্যক্তি।'[১৮৫]

বাচাল এবং সব ব্যাপারে যারা কথা বলে, নবিজি তাদের নিন্দা করেন। যে কিনা সব ইস্যুতেই লেখালিখি করে, কথা বলতে চায়—অবশ্যই সেখানে তার ভুল হবে। পরবর্তী সময়ে কথার আর গুরুত্ব থাকবে না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন—কোনো কিছুকে যদি জেলে নিতে হয়, তাহলে সেটা হলো জিহ্বা।[১৮৬]

একজন মুমিন অবশ্যই তার জিহ্বাকে সংযত করবে। সে যা বলে তাকে জেনেবুঝে বলতে হবে। তারপরও কিছু ব্যাপারে তাকে অতিরিক্ত সচেতনতা অবলম্বন করা উচিত। সেগুলো হলো—

মিথ্যা বলা : মিথ্যা বলা কখনোই মুমিনের গুণাবলি হতে পারে না। একজন মুমিন মিথ্যা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। মিথ্যা বলার পরিণাম নিয়ে পূর্বের একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বিতর্কে লিপ্ত হওয়া : এই ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। কেউ কিছু বললেই যেন আমরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ি, বিতর্কে জড়িয়ে না যাই। নবিজি বলেন, কোনো সম্প্রদায় হিদায়াতের রাস্তা পেয়ে আবার পথ ভোলা হয়ে থাকলে, তা শুধু তাদের বিবাদ ও বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কারণেই।[১৮৭]

আপনি প্রয়োজন উপলব্ধি করে মানুষের সাথে বিতর্কে নামুন। আশেপাশের অনেকেই অনেক ভুল কথা বলবে, ভুল বক্তব্য দেবে। তাই বলে সারাক্ষণ যদি আপনি বিতর্কে লিপ্ত থাকেন, দেখা যাবে—আর কোনো কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন না। নামাজে গেলেও বিতর্কের কথা বারবার মনে পড়বে।

মানুষকে উপহাস করা : মানুষকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অনেককেই দেখা যায়—কারও সাথে কথা বলা শুরু করলে অন্যের দুর্বলতা নিয়ে কথা বলে। খোঁচা দেয়। খোঁটা দেয়। মনে রাখবেন, এগুলো কখনোই মুমিনের বৈশিষ্ট্য না।

অন্যকে খোঁটা দেওয়া : অনেকেই এমন আছে, কারও উপকার করলে একসময় স্মরণ করিয়ে দেয়—মনে আছে, তুমি বিপদে পড়েছিলে। আমি টেনে তুলেছিলাম।

---

[১৮৫] জামে আত-তিরমিজি : ২০১৮

[১৮৬] *আল মাজমু আল কাবির* : ৮৭৪৫

[১৮৭] জামে আত-তিরমিজি : ৩২৫৩

আর এখন তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলো? সারাজীবন তোমাকে দান করলাম, এখন আমার ওপর কথা বলবে? এগুলোর মাধ্যমে আপনি যে উপকার করেছেন, সেই উপকারের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। নেক আমল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে মুমিনগণ! খোঁটা কিংবা কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের দান নষ্ট করো না।'[১৮৮]

গিবত ও নামিমাহ : দুটি আলাদা বিষয়, কিন্তু এখানে আমি একত্রে উল্লেখ করলাম। গিবত করা থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মনে করি, আমি তো সত্য বলছি। মূলত এই ধরনের সত্য বলে অন্যের নিন্দা করাটাও গিবতের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গিবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো।'[১৮৯]

তাহলে গিবত কী?

নবিজি গিবতের এমন স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার পর সেটা নিয়ে অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়। নবিজি একদিন সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কি জানো, গিবত কী? উত্তরে সাহাবিরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ গিবতের সংজ্ঞা দিলেন, গিবত হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে।

এমন স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার পরও সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন—আমি যা বলছি, সত্যিই যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে এমন কিছু থাকে? এ কথা শুনে নবিজি সাহাবিদের সন্দেহ দূর করে বললেন—তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ, তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে তো তুমি গিবতই করলে। আর যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তো তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে।[১৯০]

কারও গিবত শোনার পর আপনি যদি ওই লোকটিকে গিয়ে বলেন—জানো, অমুক তোমাকে কী বলেছে; তাহলে সেটা হবে নামিমাহ।

---

[১৮৮] সূরা বাকারা : ২৬৪

[১৮৯] সূরা হুজুরাত : ১২

[১৯০] সহিহ মুসলিম : ৬৪৮৭

অশ্লীল কথা ও গালাগাল : একজন মুমিন কাউকে গালি দেয় না, কটু কথা বলে না; সব সময় সে তার জবানের হেফাজত করে। কেউ তাকে গালি দিলেও প্রত্যুত্তরে সে তা ফিরিয়ে দেয় না। মুমিনের ব্যাক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবিজি বলেন—

ক. মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না।

খ. অভিসম্পাতকারী হতে পারে না।

গ. অশ্লীল ও গর্হিত কাজ করতে পারে না এবং

ঘ. কটুভাষীও হয় না।[১৯১]

আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের জীবনী পড়লে আমরা দেখতে পাই—তাঁরা কটুভাষী ছিলেন না, কখনোই অন্যকে দোষারোপ করতেন না, গালাগাল করতেন না। অপর দিকে তাঁরা জীবনের নানান প্রান্তে বহু কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন এবং সেসব সামাল দিয়েছেন দৃঢ়তার সহিত। তবুও তারা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাত্রায় ছিলেন মহান।

আমাদের এখনকার তরুণরা মনে করে গালাগাল করাটাও একধরনের স্মার্টনেস। এটা ভুল ধারণা। মুমিনের স্মার্টনেস হলো উত্তম কথা বলা, সুন্দর-কোমল ভাষায় অন্যকে সম্বোধন করা। নবিজি খুব সংক্ষেপে আমাদের জবান হেফাজতের ব্যাপারে একটি উপদেশ দেন। তিনি বলেন—যে নীরব থাকল, সে নাজাত লাভ করল।[১৯২]

মুমিন কখনো বাচাল হতে পারে না। সে নীরবতাকে বেছে নেয়। যখন যেখানে কথা বলার প্রয়োজন, শুধু সেখানেই বলে। এই ব্যাপারে নবিজি আরেকটি হাদিসে বলেন—যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।[১৯৩]

মুমিন নিজে যেমন অনর্থক কথা বলে না, তেমনই অনর্থক কথা শুনতেও পছন্দ করে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে, তখন তা পরিহার করেই চলে। নবিজি এ ব্যাপারে সতর্ক করে আমাদের বলেন, আল্লাহ তায়ালার জিকির ছাড়া বেশি কথা বলো না। কেননা, আল্লাহ তায়ালার জিকির ছাড়া বেশি কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর নিঃসন্দেহে কঠিন অন্তরের লোকই আল্লাহ তায়ালা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে।[১৯৪]

---

[১৯১] জামে আত-তিরমিজি : ১৯৭৭

[১৯২] জামে আত-তিরমিজি : ২৫০১

[১৯৩] সহিহ মুসলিম : ৮০

[১৯৪] জামে আত-তিরমিজি : ২৪১১

অন্যের সম্মান রক্ষা

একজন মুমিন যখন শুনতে পায়, তার আরেকজন ভাই অথবা বোনকে অপমান করা হচ্ছে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা হচ্ছে, তখন সে বসে থাকতে পারে না। চুপ থেকে নিজেকে শান্ত রেখে ওই সব শুনে যেতে পারে না। সে প্রতিবাদ করে। তার ভাই অথবা বোনের সম্মান রক্ষার জন্য সে দাঁড়িয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের মান-সম্মানের ওপর আঘাত প্রতিরোধ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখমণ্ডল জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিরোধ করবেন।[১৯৫]

আপনি বন্ধুদের মজলিসে বসে শুনতে পেলেন আপনার কয়েকজন বন্ধু আরেক অনুপস্থিত বন্ধুকে নিয়ে মজা করছে, ঠাট্টা করছে, তার সম্মানহানি করছে কিংবা ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে আরেকজনকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। এখন আপনার দায়িত্ব, সেই জায়গায় ওই অনুপস্থিত ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করা। সবাই তাকে নিয়ে মজা করলেও আপনি সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। আদর্শবান মুমিন হিসেবে আপনি এই কাজে বাধা দেবেন।

ওই মজলিস বা চ্যাট গ্রুপে যদি আপনি আরেকজনের সম্মান রক্ষা করেন, উপহাসকারীদের আলোচনা থামিয়ে দেন, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনাকে জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিরোধ করবেন।

অন্যের অনুপস্থিতিতে যদি তার সম্মান রক্ষা করেন, দেখা যাবে আপনার অনুপস্থিতিতেও অন্য কেউ আপনার সম্মান রক্ষা করবে। আর যদি আপনি নিজেই সারাক্ষণ অন্যের সমালোচনা করতে থাকেন, অন্যকে নিয়ে গিবত-পরনিন্দায় মেতে থাকেন, তাহলে কীভাবে আশা করেন আপনার অনুপস্থিতিতে আরেকজন আপনার পক্ষে দাঁড়াবে? কীভাবে আপনার সম্মান রক্ষা করবে? এই প্রসঙ্গে ফিকহের কিতাবে কিছু মূলনীতি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুটি হলো—

ক. আপনি যা করবেন, তা-ই পাবেন এবং

---

[১৯৫] জামে আত-তিরমিজি : ১৯৩১

খ. পাপ-পুণ্য সে রকম হবে, আপনি যে রকম করবেন।

ইমাম বুখারি (রহ.) মোট ২২টি কিতাব লেখেন। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ হলো সহিহ বুখারি। এরপর দ্বিতীয় স্থানে আছে *আল আদাবুল মুফরাদ*। এই কিতাবের একটি অনুচ্ছেদ হলো, ভাইয়ের সম্মান রক্ষা। সেখানে তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করেন। নবিজি বলেন, কারও উপস্থিতিতে কোনো মুমিন ব্যক্তির গিবত করা হলে এবং সে তার অনুপস্থিতিতে মুমিনের সাহায্য করলে আল্লাহ এর জন্য তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। (অন্যদিকে) কারও উপস্থিতিতে কোনো মুমিন ব্যক্তির গিবত করা হলো এবং সে তার সাহায্য না করলে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে এর মন্দ ফল ভোগ করাবেন।[১৯৬]

একটি মজলিসে আপনি সবার সাথে বসে আছেন। লোকজন অন্যের গিবত করছে, আপনি তাতে অংশ নিচ্ছেন না। কেবল শুনছেন। একপর্যায়ে তাদের থামিয়ে দিয়ে যদি বলেন—'ভাই! এসব বাদ দিন, গিবত করে কী হবে? আমরা ভালো কথা বলি...' তাহলে আল্লাহ আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। অন্যদিকে আপনি যদি সবার মতো কথাগুলো শুনে যান, প্রতিবাদ না করেন; দুনিয়া ও আখিরাতে এর মন্দ ফলাফল আপনাকে ভোগ করতে হবে।

নবিজি বিদায় হজের ভাষণে জীবনের সবচেয়ে বড়ো খুতবা দেন। সেই খুতবায় উপস্থিত ছিলেন লাখো সাহাবি। নবিজি সেই খুতবায় বলেন—তোমাদের রক্ত, সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত-সম্মান তেমনই সম্মানিত; যেমন সম্মানিত তোমাদের এই দিনটি এবং তোমাদের এই শহর, এই মাস।[১৯৭]

সেই ভাষণে নবিজি আরও জানিয়ে দেন—মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের রক্ত, সম্পদ যেমন সম্মানিত; আবার চাইলেই কেউ একজন আরেকজনকে হত্যা করতে পারে না। সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারে না। একইভাবে সে আরেকজনের ইজ্জতের ওপর আঘাত করতে পারে না, সম্মানহানি করতে পারে না।

মুসলিম যখন দেখে তার অপর ভাইয়ের ইজ্জতহানি হচ্ছে, সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কথা বলে, প্রতিবাদ করে। আয়িশা (রা.)-এর নামে যখন অপবাদ রটানো হয়, তখন নবিজি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে আয়িশা (রা.) ও সাফওয়ান (রা.)-এর (যার নামে অপবাদ দেওয়া হয়) অতীতের ভালো গুণের কথা উল্লেখ করেন।

---

[১৯৬] *আল আদাবুল মুফরাদ* : ৭৩৯

[১৯৭] সহিহ বুখারি : ১৭৩৯

আবদুল্লাহ (রা.) নামে নবিজির একজন মদ্যপায়ী সাহাবি ছিলেন। প্রায়শই মদ পানের অভিযোগে তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। একবার তাকে শাস্তি দেওয়ার সময় আরেকজন সাহাবি বললেন, হে আল্লাহ! তার ওপর আপনার লানত বর্ষণ করুন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যে তাকে কতবার আনা হলো! নবিজি সাহাবির এমন উক্তির প্রতিবাদ করে বললেন, তাকে লানত করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।[১৯৮]

একজন মদ্যপায়ী সাহাবির ভালো গুণের প্রশংসা যেমন নবিজি করেন, তেমনই মদ পানের জন্য তাকে শাস্তিও দেন। অন্যরা তাকে অভিশাপ দিতে চাইলে তিনি সেই সাহাবির পক্ষে কথা বলেন, তাঁর সম্মান রক্ষা করেন।

আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে যখন অপবাদ রটানো হয়। এই ঘটনা তিনি প্রথমে জানতেন না। অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসতা (রা.)। তিনি আয়িশা (রা.)-এর দূরসম্পর্কের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাপারে অপবাদ ছড়িয়ে দেন।

মিসতা (রা.)-এর মা একদিন আয়িশা (রা.)-কে বললেন, মিসতার জন্য দুর্ভোগ! তিনি বেশ অবাক হলেন। মা হয়ে উম্মে মিসতা তাঁর ছেলেকে বদদুআ করছেন! আয়িশা (রা.) মিসতা (রা.)-এর সম্মান রক্ষা করে বলেন, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন এক ব্যক্তিকে আপনি অভিশাপ দিচ্ছেন![১৯৯]

পুরো ঘটনা জানার পূর্বে তিনি মিসতা (রা.)-এর সম্মান রক্ষা করেন। এটা ছিল তাঁর স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া। তিনি কখনোই একজন মুসলিমের সম্মানহানি হতে দিতেন না।

আয়িশা (রা.)-কে যারা অপবাদ দেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)। অপবাদ আরোপের প্রায় ২০ বছর পর একদিন হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) উম্মেল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর ঘরে বেড়াতে যান। যিনি কিনা একসময় তাঁকে অপবাদ দিয়েছিলেন, এখন আয়িশা (রা.) তাঁর সাথে কেমন আচরণ করবেন? সেই দুর্বিষহ ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে অপমান করে ঘর থেকে বের করে দেবেন?

না, আয়িশা (রা.) এমন কিছুই করেননি; বরং মেহমানকে সম্মানের সাথে গদি বিছিয়ে বসতে দেন। প্রায় ২০ বছর আগে যে ব্যক্তি একজন পূত-পবিত্র নারীর

---

[১৯৮] সহিহ বুখারি : ৬৭৮০

[১৯৯] সহিহ বুখারি : ২৬৬১

চরিত্র নিয়ে অপবাদ দেন, সেই নারীই কিনা তা ভুলে গিয়ে তাকে বসার জন্য আসন পেতে দিচ্ছেন।

উম্মেল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর ভাই ছিলেন আবদুর রহমান (রা.)। তিনি বোনের এমন সহনশীলতা আর উদারতা দেখে রাগ করলেন। বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাঁকে গদির ওপর বসতে দিলেন? আপনি কি ভুলে গেলেন তিনি আপনার চরিত্র নিয়ে অপবাদ দিয়েছিলেন?

আপন ভাই মনে করিয়ে দিলেন। সে তো সত্য কথাই বলছে। আয়িশা (রা.) কি এবার আপন ভাইয়ের পক্ষাবলম্বন করে একজন মুসলিম ভাইকে তাঁর প্রায় ২০ বছর আগের কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন? তিনি ভাইকে বললেন, হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) নবিজির পক্ষ থেকে কাফিরদের কবিতার জবাব দিতেন। এতে রাসূল অন্তরে শান্তি পেতেন। এখন তিনি অন্ধ হয়েছেন। আমি আশা করি, আল্লাহ তায়ালা আখিরাতে তাঁকে শাস্তি দেবেন না।[২০০]

আয়িশা (রা.) আপন ভাইয়ের বিপক্ষে গিয়ে আরেকজন মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত হেফাজত করেন, ইতিবাচক গুণের প্রশংসা করেন। যিনি কিনা একসময় তাঁর ইজ্জত নিয়ে অপবাদ দেন।

তাবুক যুদ্ধে নারী এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম ব্যতীত সবার জন্য অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। আজ প্রস্তুতি নেব, কাল প্রস্তুতি নেব বলে কাব ইবনে মালেক (রা.) সময়মতো প্রস্তুতি নিতে পারেননি। ফলে তিনি আর ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণই করতে পারেননি।

যুদ্ধের ময়দানে নবিজি খোঁজ নিলেন, কে কে এসেছে আর কে কে অনুপস্থিত। একপর্যায়ে খোঁজ পড়ল কাব ইবনে মালেক (রা.)-এর। একজন বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর ধনসম্পদ ও অহংকার তাঁকে যুদ্ধে আসতে দেয়নি।

কাব ইবনে মালেক (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর ব্যাপারে একজন সাহাবি নিন্দা করলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর পক্ষে দাঁড়ালেন আরেকজন সাহাবি। তিনি হলেন মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)। তিনি বললেন—তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি হিসেবেই জানি।[২০১]

দেখুন, একজন মুসলিম ভাইয়ের অগোচরে মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) সেই ভাইয়ের নিন্দা করতে দিচ্ছেন না। তাঁর ব্যাপারে সুধারণা রাখছেন। মুয়াজ

---

[২০০] *তাহজিবু ইবনুল আসাকির* : ৪/১২৯

[২০১] সহিহ বুখারি : ৪৪১৮

ইবনে জাবাল অজুহাত খুঁজছেন, নিশ্চয়ই কাব ইবনে মালেক (রা.)-এর কিছু একটা হয়েছে যার ফলে তিনি আসতে পারেননি। তিনি তো ভালো মানুষ, আমলদার ব্যক্তি। অহংকার করে পেছনে থাকা তাঁর কাজ না!

উসমান ইবনে আফফান (রা.)-কে হত্যা করা হয়। যারা তাঁকে হত্যা করে, তাদের এক সমর্থক একবার হজ করতে মক্কায় আসে। সে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন করল।

—বদর যুদ্ধে উসমান অনুপস্থিত থাকেন, সেটা কি আপনি জানেন?

—আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বললেন—হ্যাঁ, জানি।

—উহুদের দিন উসমান যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যান—এ কথা কি আপনি জানেন?

—আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বললেন—হ্যাঁ, জানি।

—বাইয়াতে রিদওয়ানে উসমান অনুপস্থিত ছিলেন, আপনি জানেন?

—আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) আবার বললেন—হ্যাঁ, জানি।

—লোকটি যা চেয়েছিল, তা পেয়ে গেল। সে উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখে, এর সত্যতা পেল। আনন্দের আতিশয্যে বলল, আল্লাহু আকবার!

—এবার আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বললেন—এবার আসো, তোমাকে সেই কারণগুলো বলি।

প্রথমত, বদর যুদ্ধে উসমান (রা.)-এর অনুপস্থিতি থাকার কারণ এই—নবিজি তাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন তাঁর স্ত্রী ও রাসূলের মেয়ে রুকাইয়া (রা.)-এর দেখাশোনা করেন। কারণ, তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেও তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতো সওয়াব পাবেন এবং গনিমত লাভ করেন।

দ্বিতীয়ত, উহুদের দিন তিনিসহ যারা যারা পালিয়ে যান, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘোষণা করেন।

তৃতীয়ত, বাইয়াতুর রিদওয়ানের কারণই তো ছিল উসমান (রা.)। তিনি মক্কায় গেলে গুজব রটানো হলো, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। ফলে উসমান হত্যার বদলা নিতে সবাই বাইয়াত গ্রহণ করে। নবিজি তাঁর ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বললেন, এটাই উসমানের হাত। তিনি রূপকার্থে উসমান (রা.)-কেও সেই বাইয়াতে শরিক করেন।[২০২]

---

[২০২] সহিহ বুখারি : ৪০৬৬

লোকটি উসমান (রা.)-এর ব্যাপারে যেসব অভিযোগ নিয়ে এসেছিল, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সেইসব অভিযোগের জবাব দেন এবং উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর সম্মান রক্ষা করেন।

মানুষ সব সময় চায় বিতর্ক তৈরি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে। উসমান (রা.)-এর মতো বিশুদ্ধ ব্যক্তি, যাকে দেখে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা পেত, তাঁর ব্যাপারে মানুষ এমন বিতর্ক উঠিয়ে সম্মানহানি করে। আপনার-আমার বিরুদ্ধে যখন কেউ কুৎসা রটাবে, আমরা কী করব! তাঁদের কথা ভাবা যায়? তারা আমাদের চেয়ে কত উত্তম ছিল; তবুও তাঁদের নিয়ে মানুষজন দুর্নাম রটায়, অপবাদ দেয়। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তারা ঠিকই স্বসম্মানে আছেন।

এখন প্রশ্ন হলো—আমরা অন্যের সম্মান রক্ষা করব, ঠিক আছে। পাশাপাশি আমরা কি নিজের সম্মান রক্ষা করব না? কেউ যদি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে, সমাজে রটিয়ে দেয় অপবাদ; আমরা কি তখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য কিছু করব না?

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা থেকে আমরা এর উত্তর পাই। যখন তাঁর ব্যাপারে নারীরা অপবাদ রটিয়েছিল, তিনি আত্মরক্ষা তো করেনই। আবার নিজেকে নির্দোষও প্রমাণ করেন। অন্যদিকে আবার তাঁর আপন ভাইয়েরা চুরির অপবাদ দিলে তিনি এর জবাবে কিছুই বলেননি।

বোঝা গেল—আমাদের মানহানি হলে আমরা যেমন মান রক্ষার জন্য প্রতিবাদ জানাতে পারি, তেমনই কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেদিকে কর্ণপাত না করলেও হবে। তবে কোন ক্ষেত্রে কথা বলব আর কোন ক্ষেত্রে বলব না, এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। সারাক্ষণ যদি নিজেকে আত্মরক্ষা করতেই সময় ব্যয় করি, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতেই ব্যস্ত থাকি, তাহলে কোনো কাজে ঠিকভাবে মনোযোগ দিতে পারব না এবং কোনো একটা কাজ পুরোপুরি শেষ করতে পারব না।

একবার নবিজির উপস্থিতিতে এক লোক আবু বকর (রা.)-কে গালি দিলো। নবিজির আশপাশে তখন অন্য সাহাবিরাও ছিলেন। লোকটি একবার গালি দিলো, আবু বকর (রা.) কিছু বললেন না। দ্বিতীয়বার গালি দিলো, তখনও তিনি কিছু বললেন না। তৃতীয়বার গালি দিলে আবু বকর (রা.) প্রতিশোধ নিলেন; অর্থাৎ তিনিও গালি দিলেন।

তখন নবিজি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং খুব রাগ করলেন। মজলিস থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। আবু বকর (রা.) তখন জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি আমাকে গালি দিলো, আপনি বসা ছিলেন, কিছু বললেন না। কিন্তু আমি যখন তার জবাব দিলাম, আপনি রাগ করে চলে যাচ্ছেন!

আবু বকর (রা.) ব্যাপারটি বুঝলেন না। নবিজি কেন এমন কাজ করলেন। তিনি জবাব দিলেন, (তোমাকে যখন গালি দেওয়া হচ্ছিল) আসমান হতে একজন ফেরেশতা নেমে এসেছিলেন এবং তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু যখনই তুমি তার প্রতিশোধ নিলে, এখানে শয়তান উপস্থিত হয়েছে। শয়তান উপস্থিত হওয়ায় আমি আর বসতে পারছি না।[২০৩]

আমরা যদি দেখি কারও ব্যাপারে নিন্দা করা হচ্ছে, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, গিবত করা হচ্ছে, তখন আমরা তার পক্ষে কথা বলব। এটা মুমিন হিসেবে আমাদের দায়িত্ব। প্রকৃত মুমিন কখনো পাপ কাজ দেখে বসে থাকতে পারে না। পাপের কথা শুনতে পারে না। আপনি যদি গান শোনা হারাম বুঝতে পারেন, তাহলে গানের আসরে বসেন না; তেমনই গিবতকে হারাম বুঝলে সেই আসরেও বসবেন না। আর যদি কোনো কারণে বসেও থাকেন সেখানকার আলোচকদের গিবত বন্ধের চেষ্টা করবেন।

[২০৩] সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৯৬; মুসনাদে আহমাদ : ৯৪১১

উচ্চাকাঙ্ক্ষা

মুমিন গড়পড়তা কিছু পছন্দ করতে পারে না। তার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হয় উঁচু। নিতান্তই সাধারণ মানুষ হিসেবে সে জীবন কাটাতে চায় না। সে চায় শ্রেষ্ঠ হতে। দুনিয়াতেও শ্রেষ্ঠ, আখিরাতেও শ্রেষ্ঠ। একজন মুমিনের ভিশন বহুদূর। সমাজ পরিবর্তনে সে মুখ্য ভূমিকা রাখে। নেতৃত্ব কামনা করে না, কিন্তু নেতার মতো জীবনযাপন করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদের জীবনী পড়লে আমরা দেখতে পাই—তারা ছিলেন দুনিয়াতেও সফল, আখিরাতেও সফল। একই সাথে দুনিয়ার মানুষদের নেতা, আখিরাতের মানুষদেরও নেতা।

কোনো কোনো সাহাবি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, কেউ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, কোনো সাহাবি ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি, কেউ কেউ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফকিহ। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই ছিলেন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। কোনো সাহাবি ছিলেন সেরা ব্যবসায়ী। এমন বৈচিত্র্যময় চারিত্রিক গুণ দেখেই আমরা বুঝতে পারি, তারা একেকজন একেক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে।'[২০৪]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

> 'তোমরা আল্লাহর দিকে ছুটে চলো।'[২০৫]

অলস হয়ে বসে থাকার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসিনি। কোনো কিছু চাইতে যদি হয়ই, তাহলে ছোটো কিছু চাইব কেন? চাইলে সব সময় বড়ো কিছুই চাইব; এমনকি জান্নাতের বেলায়ও। নবিজি বলেন, আল ফিরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। তোমরা যখন জান্নাতপ্রাপ্তির দুআ করবে, তখন আল ফিরদাউসের জন্য দুআ করবে।[২০৬]

---

[২০৪] সূরা আলে ইমরান : ১৩৩

[২০৫] সূরা জারিয়াত : ৫০

[২০৬] মুসনাদে আহমাদ : ২২২৩২

নবিজি আমাদের শেখাচ্ছেন, আমরা যেন সর্বোচ্চটা অর্জনের চেষ্টা এবং এর জন্য দুআ করি। মুসলমানরা হলো ভিশনওয়ালা জাতি। তারা কখনো ছোটোখাটো স্বপ্ন দেখে না। সাহাবিরাও দেখেননি। তারা দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। এক দেশ থেকে আরেক দেশ, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ছুটে চলেন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে। সেই মুসলিম জাতি কীভাবে ছোটোখাটো স্বপ্ন দেখবে? তারা বড়ো কেন স্বপ্ন দেখতে ভয় পায় না।

আল্লাহ পৃথিবীতে আমাদের প্রেরণ করেছেন নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। সারাজীবন কারও অনুসারী হয়ে থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রেরণ করেননি।

রাবিয়া ইবনে কাব আল আসলামি (রা.) নামের নবিজির একজন মুক্ত দাস ছিলেন। তাহাজ্জুদের সময় তিনি একবার নবিজিকে অজুর পানি এনে দেন। নবিজি তাঁকে বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু চাও।

—রাবিয়া বললেন, জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই।

—নবিজি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু?

—তিনি জবাব দিলেন, আর কিছু না, কেবল এটাই চান।[২০৭]

দুনিয়াতে এত কিছু থাকা সত্ত্বেও রাবিয়া ইবনে কাব (রা.) নবিজির কাছে এই জিনিসটাই চান—রাসূলের সাথে জান্নাতে থাকা। এ থেকেই বোঝা যায় তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে, আর জীবনে কতটুকু তার প্রত্যাশা।

নবিজি সাহাবিদের নিয়ে এক মজলিসে বসা ছিলেন। এমন সময় তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে ৭০ হাজারের একটি দল বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদিসটি শোনার সাথে সাথে উকাশা ইবনে মিহসান (রা.) বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ করুন, আমাকে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবিজি দুআ করলেন, হে আল্লাহ! তাঁকে তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করুন।[২০৮]

লক্ষ করুন, উকাশা (রা.) সামান্য সময়ও অপেক্ষা করেননি। নবিজির হাদিসটি শোনামাত্রই বলে উঠলেন তাঁর জন্য যেন দুআ করা হয়। এরপর আরেকজন সাহাবি বলেন তাঁর জন্যও একই দুআ করতে। কিন্তু নবিজি জানিয়ে দেন, উকাশা আগে চেয়ে তাঁকে পরাজিত করেছেন।

জান্নাতের মোট আটটি দরজা। একেক দরজা দিয়ে একেকজন আমলকারী প্রবেশ করবে। যে আল্লাহর পথে নিঃসংকোচে জোড়ায় জোড়ায় ব্যয় করবে, জান্নাতের

---

[২০৭] সহিহ মুসলিম : ৯৮১

[২০৮] সহিহ বুখারি : ৫৮১১

দরজাসমূহ থেকে তাকে ডাকা হবে। যে বেশি বেশি সালাত আদায় করবে, তাঁকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণকারীকে ডাকা হবে জিহাদের দরজা থেকে। রোজাদার ব্যক্তিকে ডাকা হবে রাইয়্যান নামের দরজা থেকে। যে সাদাকা করেছে, তাঁকে সাদাকার দরজা থেকে ডাকা হবে।

নবিজি তাঁর সাহাবিদের এতটুকু বলার পর আবু বকর (রা.)-এর মনে একটা প্রশ্ন জাগল। তিনি জানতে চাইলেন—যে নামাজ পড়বে তাঁকে নামাজের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে রোজা রাখবে তাঁকে রোজার দরজা থেকে ডাকা হবে, যে জিহাদ করবে, তাঁকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। তাহলে এমন যদি হয়, একজন ব্যক্তি সবগুলোই করে, তাহলে কি তাঁকে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? আবু বকর (রা.)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ বলেন, হ্যাঁ। আর আমি আশা করি তুমিও তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।[২০৯]

আবু বকর (রা.) জান্নাত পাওয়ার ব্যাপারে এতটাই আশাবাদী ছিলেন—তিনি কেবল জান্নাতের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশের আমন্ত্রণ পাবেন, তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। জানতে চাইলেন, সবগুলো দরজা থেকে আমন্ত্রণ পাওয়া সম্ভব কি না। আর নবিজি আবু বকর (রা.)-এর বেলায় আশাও প্রকাশ করেন।

এই হাদিসটি শোনার পর আমরা হয়তো বলতাম, আমাদের একটি দরজা থেকেই যেন ডাকা হয়। কিন্তু আবু বকর (রা.) চিন্তা করছেন, এমন কি হতে পারে, যাকে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? একটু ভাবুন, জান্নাত লাভের জন্য তিনি কতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা ফুরকানে আল্লাহ তায়ালা আমাদের একটি দুআ শেখান। সেই দুআয় আমরা বলি—

'হে আমাদের রব!...আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানান।'[২১০]

ভালো যা কিছুই আছে, তা অর্জনের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করব, চেষ্টা করব। প্রয়োজনে নিজেকে ওই জিনিসের প্রতি সমর্পণ করে দেবো। তবুও আমরা সেরাদের সেরা হতে চাই। অতি সাধারণভাবে কোনো রকম বেঁচে থাকতে চাই না। কেবল দুনিয়াবি ক্ষমতা নয়, আমল-আখলাক-চরিত্র সকল দিক থেকেই আমরা সমাজে প্রভাবশালী হতে চাই। নবিজি বলেন, তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো, আল্লাহর সাহায্য চাও এবং কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না।[২১১]

---

[২০৯] সহিহ বুখারি : ১৮৯৭

[২১০] সূরা ফুরকান : ২৫

[২১১] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৭৯

অলসতা হলো মুনাফিকের লক্ষণ। প্রবল কর্মক্ষমতা হলো মুমিনের গুণ। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের নামাজ সম্পর্কে বলেন—

> 'তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে লোকদেখানোর জন্য দাঁড়ায়।'[২১২]

মুনাফিকরা নামাজে দাঁড়ানোর সময় আত্মমনোবল পায় না। সঞ্চারিত শক্তি কাজে দেয় নাভ অলস হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে নবিজি এইসব অলসতা, অক্ষমতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। তিনি দুআ করেন—

> 'হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই।'[২১৩]

নেতা ও কর্মীর মাঝে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। তার মধ্যে একটি হলো—নেতার কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষাই থাকে না, সেটা কীভাবে লাভ করতে হয় তিনি প্রচেষ্টা চালান এবং অন্যকেও তাতে উদ্‌বুদ্ধ করেন। একজন মুমিন যেমন পরিকল্পনা করে, তেমনই তা কাজে পরিণত এবং এর ফলাফল প্রত্যাশা করে। মুমিন শুধু এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া নিয়ে পরিকল্পনা করে না, সে আখিরাত নিয়েও পরিকল্পনা করে।

আপনি যখন কোনো কাজ করবেন, সেটা ভালোভাবে করবেন। আল্লাহ তাঁদেরই পছন্দ করেন, যারা কোনো কাজের ইচ্ছা পোষণ করলে তা যথাযথভাবে শেষ করে। পরীক্ষায় সি-গ্রেড পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দেবেন না। পরীক্ষা দেবেন এ+ পাওয়ার জন্য। আপনি যে কাজ করবেন, সেটা নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে করবেন। নবিজি বলেন—আল্লাহ সেই কাজটি পছন্দ করেন, যা যথাযথভাবে করা হয়।[২১৪]

আপনি যখন যুদ্ধে যাবেন, তখন নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে যুদ্ধ করুন। যখন পশু জবাই করবেন, তখন সেটা ভালোভাবে জবাই করুন। জবাই করার পূর্বে অস্ত্র ভালোভাবে ধার করে নিন। মুরগি, ছাগল বা গরুটা যেন কম কষ্ট পায়, এই দিকগুলোও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, এটাই ইসলামের বিধান।

চিন্তা করুন—একটি মুরগি জবাই করতেই যদি এর যথার্থতা ভালোভাবে আদায় করতে হয়, তাহলে আমরা যে চাকরি করি, ব্যাবসা করি, তা কীভাবে করা উচিত? কতটুকু আমানতদার হওয়া প্রয়োজন? মুমিনরা 'কোনো রকমে' কোনো কাজ করতে পারে না। মুমিন যে কাজটি করে কিংবা করার প্রয়াস চালায়, তা সবচেয়ে

---

[২১২] সূরা নিসা : ১৪২

[২১৩] সহিহ বুখারি : ২৮২৩

[২১৪] *তাবরানি* : ৯০১

ভালোভাবে করে। নবিজি বলেন—যদি কিয়ামত সংঘটিত হয়, আর এটা অবশ্যম্ভাবী, তখন যদি হাতে একটি চারাগাছ থাকে, সেটাও রোপণ করো।[২১৫]

অর্থাৎ, আপনার হাতে একটি চারাগাছ, কিন্তু মনে হচ্ছে কিয়ামত সংঘটিত হবে। গাছটি রেখে কি আপনি দৌড়ে পালাবেন? না, কিয়ামত সংঘটিত হলে আপনি দৌড়-ঝাঁপ করে এদিক-সেদিক কোথাও পালাতে পারবেন না। যার দরুন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলাম আপনাকে আশা সঞ্চার করে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছে। গাছ লাগানো, সামাজিক দায়বদ্ধতাকে ইসলাম এতটা গুরুত্ব দিয়েছে যে, উদাহরণস্বরূপ বুঝিয়ে দিচ্ছে—কিয়ামতের মতো মহাবিপর্যয়ের মুহূর্তেও আপনি হাল ছাড়বেন না, মানুষের তরে কাজ করে যাবেন।

---

[২১৫] মুসনাদে আহমাদ : ১২৪৯১

অন্যকে সালাম দেওয়া

মুমিনের একটি সহজ গুণ হলো, সে অন্যকে সালাম দেয়। কারও জন্য অপেক্ষা করে না, কেউ তাকে সালাম দেবে। অন্য কেউ তাকে সালাম দেওয়ার আগে সে নিজেই সালামের সূচনা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর প্রথম যে ভাষণ দেন, সেখানে তিনি বলেন—হে মানুষগণ! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য দান করো, মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাজ আদায় করো। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সহজে জান্নাত লাভ করবে।[২১৬]

মদিনার হিজরতের পর নবিজির প্রথম নির্দেশ ছিল—সালামের প্রসার ঘটাও। যাকে দেখবে, তাকে সালাম দিতে হবে। এমন নির্দেশনাই তিনি দিয়েছেন।

একবার এক সাহাবি নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, ইসলামের কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে নবিজি বলেন, তুমি লোকদের খাদ্য খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দেবে।[২১৭]

আপনি কী রকম পোশাক পরে আছেন এর ওপর নির্ভর করছে না আপনার ইসলাম কেমন, আর শ্রেষ্ঠ কি না। ইসলাম ঠিকমতো পালন হচ্ছে কি না, তা নির্ভর করছে আপনার আমলের ওপর, কর্মের ওপর। অর্থাৎ সর্বোত্তমভাবে আপনি মানুষকে খাওয়াচ্ছেন কি না, খোঁজখবর রাখছেন কি না, মানুষকে সালাম দিচ্ছেন কি না এবং এর প্রসার ঘটাচ্ছেন কি না।

আমরা সাধারণত চেনা-পরিচিত মানুষদের সালাম দিই। অচেনাদের সালাম দিই না। সুড়সুড় করে পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাই। এটা ঠিক না। নবিজি জানিয়ে দেন, চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দিতে হবে। আমি যদি বুঝতে পারি যিনি আমার পাশ অতিক্রম করছেন তিনি মুসলিম, তাহলে তাকে সালাম দেবো; তাকে না চিনলেও সালাম দেবো।

---

[২১৬] জামে আত-তিরমিজি : ২৪৮৫

[২১৭] সহিহ বুখারি : ২৮

মুসলিমের ওপর মুসলিমের হক ছয়টি। তার মধ্যে একটি হক হলো, কারও সাথে দেখা হলে সালাম দেওয়া।[২১৮] কেউ যদি আপনাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে, তাহলে আপনার ওপর সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। নবিজি বলেন, এক মুসলিমের ওপর আরেক মুসলিমের হক পাঁচটি। তার মধ্যে একটি হলো—সালামের জবাব দেওয়া।[২১৯] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

> 'আর যখন তোমাদের সালাম দেওয়া হবে, তোমরা তারচেয়ে উত্তম সালাম দেবে অথবা জবাবে তা-ই বলবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ হিসাব গ্রহণকারী।'[২২০]

কেউ যদি আপনাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে, জবাবে আপনি বলুন 'ওয়ালাইকুমুস সালাম'। অথবা ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ বা ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাবাতুহ। আপনি যেভাবে সালাম দেবেন, তার ওপর আপনার সওয়াব নির্ভর করবে।

- আসসালামু আলাইকুম বললে ১০ নেকি
- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বললে ২০ নেকি
- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ বললে ৩০ নেকি পাবেন।[২২১]

আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ বললেন, তুমি ফেরেশতাদের সালাম দাও এবং তাঁরা সালামের জবাবে কী বলে সেটা মনোযোগের সাথে শুনবে। কারণ, এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ।[২২২]

এজন্য আমরা দেখতে পাই, ইবরাহিমি ধর্মের অনুসারীদের সম্ভাষণ হলো সালাম। ইহুদিরা বলে—সালমালিকুন, খ্রিষ্টানরাও একই কথা বলত বলে জানা যায়। নবিজি বলেন, ঈমানদার ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না, কী করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? শুনে রাখো, তা হলো—তোমরা পরস্পর বেশি বেশি সালাম বিনিময় করবে।[২২৩]

---

[২১৮] সহিহ মুসলিম : ৫৫৪৪
[২১৯] সহিহ বুখারি : ১২৪০
[২২০] সূরা নিসা : ৮৬
[২২১] জামে আত-তিরমিজি : ২৬৮৯
[২২২] সহিহ বুখারি : ৬২২৭
[২২৩] সহিহ মুসলিম : ৯৮

এই হাদিসটি শুরু হয়েছে 'কী করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে' এই কথার মধ্য দিয়ে। শেষ হয়েছে সালাম বিনিময়ের নির্দেশ দিয়ে। অর্থাৎ, জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম একটি সহজ রাস্তা হলো বেশি বেশি সালাম বিনিময় করা। যখন কাউকে সালাম দিই, এর মানে কী দাঁড়ায়?

ক. 'আস-সালাম' হলো আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। যখন কাউকে সালাম বলি, তার মানে আমি তার জন্য দুআ করি—আল্লাহ তোমাকে শান্তিতে রাখুন, নিরাপদ রাখুন, তোমার কল্যাণ করুন।

খ. সালাম করা মানে তার জন্য দুআ করা। সালাম মানে যেমন শান্তি, তেমনই এর আরেকটি অর্থ হলো ক্ষতি মুক্ত। আমি তাকে জানাচ্ছি—তোমার যেন কোনো ক্ষতি না হয়, তোমার ওপর যেন কোনো বিপদ না আসে, তোমার দুশ্চিন্তা যেন কমে যায়।

গ. আমি যখন অন্যের বিপদমুক্ত, কষ্টমুক্ত, দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার প্রার্থনা করছি, তখন এমনিতেই তাকে জানিয়ে দিচ্ছি—অন্তত তোমার কোনো ক্ষতি আমি করব না। তুমি আমার দিক থেকে নিরাপদ। একজনকে বললাম, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা বলার পর আমি কীভাবে তার জীবনে অশান্তির কারণ হতে পারি? তার পাওনা টাকা দিচ্ছি না, তার নামে গিবত করছি, তার দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাকে শারীরিক-মানসিক আঘাত করছি। এমনটা করলে তো বোঝা গেল, আমি বলছি এক আর করছি আরেক!

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) প্রায় সময় বাজারে যেতেন, কিন্তু তেমন কিছু কিনতেন না। লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করত—আপনি তো কিছু কেনেন না, তারপরও বাজারে যান কেন? জবাবে তিনি বলতেন, যাতে আমি আমার ভাইদের সালাম দিতে পারি।

সালাম দেওয়া এমন একটা গুণ, যে কেউ তা অর্জন করতে পারি। এটা খুবই সহজ। আমরা অপেক্ষায় থাকব না, কেউ আমাদের সালাম দিচ্ছে কি দিচ্ছে না। কেউ সালাম দেওয়ার আগেই আমরা তাকে সালাম দেবো।

নবিজি সব সময় আগে সালাম দিতেন; এমনকি শিশুদেরও সালাম দিতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, মদিনার পথে একদল শিশু খেলা করছিল। নবিজি তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দেন।[২২৪]

---

[২২৪] সহিহ বুখারি : ৬৩৪৭

আল্লাহ হলেন 'আস-সালাম'। তিনি আমাদের দান করবেন—'দারুস সালাম' (জান্নাতের একটি নাম হলো দারুস সালাম; কারণ, সেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই)। আমাদের ধর্মের নামও ইসলাম। নবিজি সব সময় চাইতেন আমরা যেন সালাম দিই।

তার মানে এই কথা প্রমাণ হয়—আমরা যদি সালাম দিই, ইসলামের অনুশাসন মেনে চলি, তাহলে 'আস-সালাম' আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে দারুস সালাম দান করবেন। জান্নাতে প্রবেশের পর ফেরেশতারা জান্নাতিদের অভ্যর্থনা জানাবেন সালামের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন—

> 'আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে, তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে, তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদের বলবে—তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভালো ছিলে। অতএব, স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ করো।'[২২৫]

[২২৫] সূরা জুমার : ৭

সহজতা অবলম্বন

মুমিনের অন্যতম গুণাবলি হলো, মুমিন সহজ ও কোমল আচরণ করে। অনেক মানুষ আছেন—তারা খুব জটিল, আচরণ ঔদ্ধত্য। মানুষ তাদের সাথে মিশতে চায় না। সহজ বিষয়কে তারা প্যাঁচাতে থাকে। এমন জটিল প্রকৃতির মানুষ থেকে অন্যরা দূরে থাকে। কিন্তু মুমিনের আখলাক এমন না। মুমিন সহজ প্রকৃতির। সে মানুষের সাথে নম্র আচরণ করে, ভদ্রভাবে কথা বলে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।'[২২৬]

কথাটি আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন। তিনি যদি সাহাবিদের প্রতি কোমল আচরণ না করতেন, তাহলে সাহাবিরা তাকে ছেড়ে চলে যেত! তা ছাড়া আল্লাহর রহমতের কারণে নবিজি তাঁদের প্রতি কোমল আচরণ করেন।

নবিজি আমাদের আদর্শ। তিনি মানুষের সাথে কোমল আচরণ করতেন, আমরাও নবির আদর্শে পা বন্দি হয়ে মানুষের সাথে কোমল আচরণ করব। কার সাথে আচরণ করব, সেটা ব্যাপার না। বাবা-মা, শিক্ষক, রিকশাওয়ালা, দোকানদার সবার সাথেই আমরা কোমল আচরণ করব। এটা তো মুমিনের স্বাভাবিক আচরণ। তবে হ্যাঁ, প্রয়োজনে কঠোর হব; কিন্তু বাকি সময়টুকু কোমলতা প্রদর্শন করব।

মুসা (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে দাওয়াতের জন্য পাঠান। ফেরাউনের মতো নিপীড়ক, কাফিরের সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে আল্লাহ সেটা জানিয়ে দেন। আল্লাহ বলেন—

> 'তোমরা (মুসা ও হারুন) তার (ফেরাউন) সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।'[২২৭]

---

[২২৬] সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

ফেরাউনের মতো কাফিরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য যদি আল্লাহ নম্রভাবে কথা বলতে বলেন, আপনি কীভাবে আপনার মুসলিম ভাইকে কঠোর ভাষায় উপদেশ দেন? কীভাবে রিকশাওয়ালার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করেন? কাজের লোকের সাথে কেন কঠোর ভাষায় কথা বলেন?

একবার নবিজি সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেন—আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না, কোন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম এবং জাহান্নামের জন্য কোন ব্যক্তি হারাম? সাহাবিরা জানতে চাইলে তিনি বলেন—যে ব্যক্তি মানুষের কাছাকাছি, সহজ-সরল, নম্রভাষী ও সদাচারী।'[২২৮]

যে মানুষ খুব সহজ-সরল (বোকা না), তার সাথে মিশতে মানুষের ভালো লাগে। তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করতেও ভালো লাগে, কেমন আছ? সে যেমন মানুষের সাথে মিশে, অন্যরাও তার সাথে মিশে। যে মানুষ অন্যের সাথে এমন সুন্দর আচরণ করে, অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকে; জাহান্নাম তার জন্য হারাম এবং জাহান্নামের জন্যও সে হারাম। নবিজি বলেন—তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে নাও, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও এবং উভয়ের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা বন্ধ করো। আর তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও।[২২৯]

আপনি অবাক হতে পারেন এই ভেবে—নামাজের কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে নম্রতার কথা, সহজতার কথা কেন আসছে? খেয়াল করলে দেখবেন, নামাজে ফাঁকা জায়গা থাকলে কাউকে পেছনের কাতার থেকে সামনে আসতে বললে সে আসতে চায় না। হয়তো ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়েছে বা আগে এসে ওই জায়গায় দাঁড়িয়েছে। দু-একবার বলার পর সে অনেকটা রাগ করেই জবাব দেয়, আমাকে বলছেন কেন? আর কেউ নেই? তাদের বলুন!

অর্থাৎ একটা ভালো কথা বলার সময় সে মেজাজ দেখাচ্ছে। তার সঙ্গে বিনয় সুরে কথা বললেও সে কোমল আচরণ করছে না। কেউ হয়তো জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজে দাঁড়িয়েছে। আরেকজনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ, তার পাশের দুজন তার জায়নামাজে আসছে না। সে তাদের নম্রভাবে বলল, ভাই! আসেন, জায়নামাজে আসেন। তার এই সহজতা, নম্রতার জন্য আরেকজন যদি তার জায়নামাজে দাঁড়ায়, নামাজের কাতার সোজা হয়ে যাবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো হবে।

---

[২২৭] সূরা ত্বহা : ৪৪

[২২৮] জামে আত-তিরমিজি : ২৪৮৮

[২২৯] সুনানে আবু দাউদ : ৬৬৬

মুমিন হবে সহজ প্রকৃতির। যে পরিস্থিতিতে যেমন আচরণ করা উচিত, সে তেমন আচরণই করবে। ছোটো শিশু দেখলে আমরা তার সাথে তেমনভাবে কথা বলি না, কাছে ডাকি না; যেমনভাবে বড়োদের সাথে কথা বলি। বন্ধুদের সাথে যে ভাষায় কথা বলি, একই ভাষায় আবার মা-বাবার সাথে কথা বলি না।

একবার এক লোক নবিজির ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইল। নবিজি আয়িশা (রা.)-এর কাছে লোকটির ব্যাপারে মন্তব্য করলেন, সে সমাজের নিকৃষ্ট লোক এবং সমাজের দুষ্ট সন্তান।

কিন্তু লোকটি ঘরে ঢুকলে নবিজি তার সাথে হাসিমুখে কথা বলেন। লোকটি চলে যাবার পর আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহর এমন অদ্ভুত আচরণের কারণ জানতে চান। অর্থাৎ, লোকটি যদি খারাপই হয়ে থাকে, নবিজি কেন তার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন।

আমাদের প্রিয় নবি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তো তিনি লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না। তিনি আয়িশা (রা.)-কে বললেন, ও আয়িশা! তুমি কি কখনো আমাকে অশালীন (আচরণ করতে) দেখেছ?

অতঃপর নবিজি এক সতর্কবার্তা দেন। আমরা তো মনে করি শুধু নামাজ পড়ে আর হজ করে এলেই মনে হয় আর কিছু লাগবে না। অথচ মানুষজন আমার সাথে মিশতে চায় না, আমাকে দেখলে এড়িয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে নবিজি বলেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার দুষ্টামির কারণে মানুষ তাকে ত্যাগ করে।[২৩০]

সর্বাবস্থায় মানুষের সাথে আমাদের সহজ আচরণ করতে হয়, কোমল ভাষায় হাসিমুখে কথা বলতে হয়; বিশেষ করে কেনাবেচার সময়। আপনি একজন বিক্রেতা। কোনো একটি পণ্য ৮০০ টাকা দাম পেলেই বিক্রি করে দেবেন। কিন্তু ক্রেতার কাছে দাম হাঁকালেন ৩০০০ টাকা। ক্রেতা দাম বলা শুরু করল ৫০০ টাকা থেকে। এভাবে দামাদামি চলতে চলতে ৫ মিনিট পর ৮০০ টাকায়ই বিক্রি করলেন। অথচ শুরুতে ১০০০-১২০০ টাকা বললে ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনের মাঝখানে কথা চালাচালি আর এত ভোগান্তি হতো না। কেনাবেচায় দুজনেরই সহজ হতো। এ প্রসঙ্গে নবিজি বলেন—আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়।[২৩১]

---

[২৩০] সহিহ বুখারি : ৬০৩২

[২৩১] সহিহ বুখারি : ২০৭৬

নবিজি সাহাবিদের একটি ঘটনা বলেন। পূর্ববর্তী যুগের এক লোক ব্যক্তির রুহের সাথে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কোনো নেক কাজ করেছ।

—সে বলল, না।

—ফেরেশতা বলল, মনে করে দেখো তো।

—তখন সে একটি নেক কাজের কথা উল্লেখ করে, আমি মানুষকে ঋণ দিতাম। তারপর আমার কর্মচারীদের নির্দেশ দিতাম, অসচ্ছল ব্যক্তিদের সুযোগ দিতে ও সচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে। হয়তো এই কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

লোকটি সবাইকে ঋণ দিত। গরিবরা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তাদের ঋণ ক্ষমা করে দিত এই আশায়, আল্লাহ হয়তো এই ওসিলায় তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ সত্যি সত্যি এই ওসিলায় তাকে ক্ষমা করে দেন।[২৩২]

নবিজি একবার জনৈক ব্যক্তির কাছে থেকে ঋণ নেন। ঋণের মেয়াদ পূর্তির আগে লোকটি নবিজির কাছে পাওনা দাবি করে। নবিজি সাহাবিদের বললেন, তাকে একটি উট দিতে। সাহাবিরা উট দিতে গিয়ে দেখেন, সে যে সাইজের উট ঋণ হিসেবে দিয়েছিল, এই উট তার চেয়েও বড়ো। তা ছাড়া ওই সাইজের কোনো উট নেই, যা আছে সব বড়ো বড়ো। তখন নবিজি তাকে বড়ো সাইজের উটটিই দিলেন। উট গ্রহণের সময় নিয়েছিলেন ছোটো উট, আর দেওয়ার সময় দিলেন বড়ো উট। নবিজি তখন বলেন—তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় উত্তম।[২৩৩]

এটা সুদ নয়। কারণ, ঋণ গ্রহণের সময় এমন কোনো চুক্তি ছিল না। নবিজি তার সাথে কোমল আচরণ করেন, নম্র আচরণ করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি ঋণ ফিরিয়ে দেওয়ার সময় যে পরিমাণ ঋণ নিতেন, তার চেয়ে বেশি ফিরিয়ে দিতেন। এটা হলো ঋণের উত্তম প্রতিদান, উত্তম পরিশোধ।

উসমান ইবনে আফফান (রা.) একবার একটি জমি কেনেন। কেনার পর পূর্বের মালিক জমিটি তাকে বুঝিয়ে দেয়নি। কারণ, লোকজন তাকে কানপড়া দেওয়ায় সে মনে করে খুব কম দামে জমিটি বিক্রি করে ফেলেছে।

জমি কেনাবেচা শেষ। উসমান (রা.) চাইলে বলতে পারতেন—তুমি বিক্রি করে ফেলছ, তোমার আর কিছু করার নেই, এখন এই জমির মালিক আমি। যদিও এ

---

[২৩২] সহিহ বুখারি : ২০৭৭, ৩৪৮০; সহিহ মুসলিম : ৩৮৮৫

[২৩৩] সহিহ বুখারি : ২৩০৬

কথা বলার অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি তা বলেননি। তিনি নবিজির একটি হাদিস স্মরণ করে জমিটি মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেন। হাদিসটি ছিল এই, নবিজি বলেন—ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে ব্যক্তি সহজতা প্রদর্শন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[২৩৪]

কোমলতা, সহজতার গুণগুলোকে আমাদের চারিত্রিক গুণাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব। আমরা যদি মানুষের সাথে কোমল আচরণ করি, নরম ভাষায় কথা বলি—আল্লাহ আমাদের সাথে কোমলতা প্রদর্শন করবেন। নবিজি তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.)-কে বলেন, হে আয়িশা! আল্লাহ কোমল। তিনি সকল কাজে কোমলতা পছন্দ করেন।[২৩৫]

[২৩৪] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২০২
[২৩৫] সহিহ বুখারি : ৬৯২৭

ন্যায়বিচার

আল্লাহ যে কারণে কুরআন নাজিল করেন, তার অন্যতম কারণ হলো ন্যায়বিচারের গুণ প্রতিষ্ঠা করা। মুমিনের অন্যতম একটি গুণ হলো, সে ন্যায়বিচারী; নিজে অন্যায় করে না, অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দেয় না। খেয়াল করলে শুনে থাকবেন—পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত জুমুআর খুতবায় খতিব তিলাওয়াত করেন—'ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান...' যার অর্থ করলে দাঁড়ায়—'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন।'[২৩৬]

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর সময় থেকে জুমার খুতবায় এই আয়াতটি তিলাওয়াত করা হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রায় সবগুলো দেশের খতিব এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, যেখানে আল্লাহ বলেছেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দেন। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে; যদিও তা তোমাদের কিংবা মা-বাবার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও, তবে (জেনে রাখো) তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।'[২৩৭]

আপনাকে যদি এমন কিছু বলতে হয়, এমন কোনো বিচার করতে হয়, যা আপনার মা-বাবার বিরুদ্ধে যায়, আপনার ভাই-বোনের বিরুদ্ধে যায়, তখনও আপনি ন্যায়ের পক্ষে থাকবেন। যদিও এই কাজটি সবচেয়ে কঠিন। নিজের পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের কোনো ঝামেলা হলে আমরা বুঝে না-বুঝে পরিবারের পক্ষে থাকি। কে ঠিক আর কে ভুল সেটা ভুলে যাই। কিন্তু ন্যায়ের

---

[২৩৬] সূরা নাহল : ৯০

[২৩৭] সূরা নিসা : ১৩৫

বেলায় নিজের মা-বাবার চেয়ে আল্লাহর হক বেশি। এক্ষেত্রে মা-বাবার কথা না ভেবে ন্যায়ের কথা ভাবতে হবে।

আপনি যখন বিচার করবেন, ঘটনা এবং অপরাধ দেখে বিচার করবেন, ব্যক্তি দেখে নয়। কাজটি 'কী' করা হয়েছে তা দেখে বিচার করবেন, 'কে' করেছে সেটা দেখে নয়। যদি এমন হয়—এই কাজটি অন্য কেউ করলে আপনি একধরনের শাস্তি দেন অথচ আপনজনদের মধ্যে কেউ করলে আরেক ধরনের শাস্তি দেন, তাহলে আপনি ন্যায়বিচার করতে পারলেন না। স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিলেন। বিচারের বেলায় এই ধরনের স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নেওয়া যাবে না।

পাশ্চাত্যে ন্যায়বিচারকে প্রতীকী অর্থে বোঝানোর জন্য ভাস্কর্যস্বরূপ একজন চোখবাঁধা নারীকে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। রূপকার্থে বোঝানো হয়—চোখ বাঁধলে সে দেখতে পায় না ঘটনাটি কে করেছে, কার সাথে ঘটেছে। বরং সে দেখতে পায়, কী ঘটেছে। ন্যায়পরায়ণতা মানে আইনের চোখে সবাই সমান; আপন-পর বলতে কিছু নেই।

আপনার মা-বাবা যদি কোনো অন্যায় করেন, আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন। এটা আল্লাহর আদেশ। এক্ষেত্রে আপনার জন্মদাতা-জন্মদাত্রী মা-বাবার চেয়ে আল্লাহর আদেশ গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আরও বলেন—

> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা অবিচল থেকো। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের প্ররোচিত না করে : তোমরা ন্যায়বিচার করবে না। তোমরা ন্যায়বিচার করো, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো।'[২৩৮]

পূর্বের আয়াতে আল্লাহ বলেন নিজের সবচেয়ে কাছের মানুষ কোনো অপরাধ করলে ন্যায়বিচার করতে, এই আয়াতে আল্লাহ বলেন—আপনার কোনো শত্রু কোনো অপরাধ করলে তার প্রতিও ন্যায়বিচার করতে। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এই দুটি কাজই সবচেয়ে কঠিন।

ক. নিজের আপনজনের বিপক্ষে ন্যায়বিচার করা এবং

খ. নিজের শত্রুর পক্ষে ন্যায়বিচার করা।

আপনার কোনো শত্রু যদি আপনার কাছে ন্যায়বিচারের জন্য আসে; সে যে আপনার শত্রু এটা ভুলে যেতে হবে। বিচারের সময় তার কাজের ওপর বিচার

---

[২৩৮] সূরা মায়েদা : ৮

করতে হবে; বন্ধু নাকি শত্রু সেটা বিবেচ্য নয়। মুমিনের আদর্শিক ব্যক্তিত্বের অন্যতম উপাদান হলো ন্যায়পরায়ণতা। রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ ন্যায়বিচারের আদেশ দেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে জানিয়ে দিতে বলেন—

'তোমাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে।'[২৩৯]

আল্লাহ পৃথিবীতে নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন ন্যায়বিচারের জন্য। মানুষের মাঝে যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়, সেই উদ্দেশ্যে নবি-রাসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'নিশ্চয় আমি রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়ের মানদণ্ড নাজিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।'[২৪০]

আরবিতে একটি প্রবাদ আছে, কোনো কিছু চিনতে হলে তার বিপরীতটা দেখতে হবে। ন্যায়বিচারের বিপরীত হলো জুলুম। ন্যায়বিচারের গুরুত্ব কত বেশি, সেটা জুলুমের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। যে একবার প্রতারণার শিকার হয়েছে, জুলুমের শিকার হয়েছে, সে জানে ন্যায়বিচারের মূল্য কী!

জুলুম আর শিরক প্রায় সমার্থক। লুকমান (আ.) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন—শিরক হলো সবচেয়ে বড়ো জুলুম। আল্লাহ জালিমদের অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা জুলুম করেছে।'[২৪১]

একই প্রসঙ্গে নবিজি বলেন, জুলুম কিয়ামতের দিন ঘোরতর অন্ধকারে পরিণত হবে।[২৪২] আপনি যদি দুনিয়াতে থাকাবস্থায় কারও ওপর জুলুম করেন, সেটার ফল দুনিয়াতে না পেলেও আখিরাতে পাবেন। দুনিয়াতে কারও ওপর জুলুম করলে বেঁচে থাকাবস্থায় তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিন, তার অধিকার ফিরিয়ে দিন। যদি তা না করেন, তাহলে কিয়ামতের দিন আপনার নেক আমল তাকে দেওয়া লাগবে। রাসূলুল্লাহ বলেন—যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোনো বিষয়ে জুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে তা মাফ করিয়ে নেয় সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন তার কোনো দিনার/দিরহাম থাকবে না।

---

[২৩৯] সূরা শুরা : ১৫
[২৪০] সূরা হাদিদ : ২৫
[২৪১] সূরা ইউনুস : ১৩
[২৪২] সহিহ মুসলিম : ৬৪৭১

সেদিন তার আমলনামায় কোনো সৎকর্ম না থাকলে, তার জুলুমের সমপরিমাণ তার নিকট থেকে নেওয়া হবে। আর যাদি তার কোনো সৎকর্ম না থাকে, তবে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে নিয়ে তা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।[২৪৩]

দুনিয়াতে থাকাবস্থায় জুলুমের শোধ করতে না পারলে যার ওপর জুলুম করেছেন, সে আপনার নেক আমল নিয়ে যাবে। আর যদি আপনার কোনো নেক আমল না থাকে, তবে তার গুনাহের ভার আপনার ওপর দেওয়া হবে। আপনি যদি কারও হক আত্মসাৎ করেন, কাউকে টাকা না দিয়ে তার কাছ থেকে কোনো কিছু জোর করে ছিনিয়ে নেন, তাহলে আজই তার নিকট মাফ চান, টাকাগুলো ফেরত দিয়ে দিন। নতুবা কিয়ামতের দিন এই টাকার বিনিময়ে আপনার নেক আমল সে নিয়ে নেবে। আমাদের আলিমগণ বলেন, জুলুম তিন প্রকার। সেগুলো হলো—

ক. আল্লাহর সাথে জুলুম, যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। সেটা হলো শিরক।

খ. বান্দার সাথে জুলুম; কিয়ামতের দিন এক তিল পরিমাণ জিনিসও যদি কারও সাথে লেনদেন থেকে থাকে, এর হিসাব দিয়ে পার পেতে হবে। আপনি কারও সাথে কোনো অন্যায় করে দুনিয়াতে পার পেলেও কিয়ামতের দিন কোনোভাবেই পার পাবেন না।

গ. নিজের সাথে জুলুম। আপনি যদি গোপন পাপ করেন, আল্লাহ চাইলে সেটা ক্ষমা করে দেবেন।

আপনি অন্যের সাথে জুলুম করলে আল্লাহ সেটা ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না যার সাথে জুলুম করেছেন সে আপনাকে ক্ষমা করে। নবিজি বলেন, মজলুমদের বদদুআকে ভয় করবে। কেননা, তাদের বদদুআ এবং আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকে না।[২৪৪]

আপনি যার ওপর জুলুম করবেন, সে যদি আপনার বিরুদ্ধে দুআ করে, আল্লাহ সেই দুআ সরাসরি কবুল করে নেন। আল্লাহ জালিমদের ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না। তারা যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। নবিজি বলেন, আল্লাহ জালিমদের ছাড় দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না।[২৪৫]

---

[২৪৩] সহিহ বুখারি : ২৪৪৯

[২৪৪] সহিহ বুখারি : ৪৩৪৭

[২৪৫] সহিহ বুখারি : ৪৬৮৬

একই প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন, যদিও তা কাফির রাষ্ট্র হোক না কেন। কিন্তু আল্লাহ জালিম রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন না, যদিও তা মুসলিম রাষ্ট্র হোক না কেন।[২৪৬] এই কথার প্রমাণ আমরা বর্তমান সময়েও দেখতে পাই। অনেক অমুসলিম রাষ্ট্রকে আল্লাহ সাহায্য করছেন; কিন্তু মুসলিমপ্রধান দেশগুলো জালিম শাসকের দ্বারা শাসিত হওয়ার কারণে আল্লাহর সাহায্য পাচ্ছে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কথার স্বপক্ষে ইমাম তাবরানির বর্ণনায় একটি হাদিস পাওয়া যায়। নবিজি বলেন—যারা ন্যায়পরায়ণ, তাদের ঈমান না থাকলেও আল্লাহ তাদের কিছুটা সুরক্ষা দেন। অন্যদিকে যাদের ঈমান আছে, কিন্তু তারা অত্যাচারী; আল্লাহ তাদের সুরক্ষা করেন না।

মক্কা বিজয়ের পর নবিজির কাছে একটি বিচার নিয়ে আসা হয়। মাখজুম গোত্রের এক নারী চুরি করে। সে ছিল আবু লাহাবের গোত্রের সম্ভ্রান্ত মহিলা। সবাই ভেবেছিল রাসূলুল্লাহ হয়তো তাকে ক্ষমা করে দেবেন। নবিজির কাছে সুপারিশ করার জন্য পাঠানো হয় তাঁর প্রিয় সাহাবি উসামা ইবনে জায়েদ (রা.)-কে। একজন সম্ভ্রান্ত নারীর পক্ষে সাহাবির সুপারিশ শুনে রাসূলুল্লাহ খুব রাগ করেন। তিনি বলেন—

তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এই কাজের জন্য ধ্বংস করা হয়েছে। যখন তাদের মধ্যে কোনো বিশিষ্ট লোক চুরি করত, বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায়-গরিব এবং সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার ওপর শাস্তি কায়েম করত। আল্লাহর কসম! আজ যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।[২৪৭]

ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গ উঠলে আমরা বেশির ভাগ সময় অন্যের দিকে তাকাই। বলা শুরু করি—অমুক নেতা ন্যায়বিচার করেন না, অমুক শাসক ন্যায়বিচার করেন না। হ্যাঁ, ওই শাসক ন্যায়বিচার না করলে আল্লাহ তার বিচার করবেন। আমরা নিজেরা ন্যায়বিচার করি কি না, সেটাই হলো আসল প্রশ্ন। আমাদের সন্তান, স্ত্রী, আত্মীয়ের সাথে ন্যায়বিচার করি কি না, সেই বিষয়ে আল্লাহ আমাদের জিজ্ঞেস করবেন। সন্তানদের সাথে যেন ন্যায়বিচার করেন, সেজন্য নবিজি নির্দেশ দিয়ে বলেন—সন্তানদের সাথে তোমরা ন্যায়বিচার করবে, তোমাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করবে।[২৪৮]

---

[২৪৬] ইবনে তাইমিয়া, *মাজমুয়ুল ফাতাওয়া* : ২৮/৬৩

[২৪৭] সহিহ বুখারি : ৩৪৭৫

[২৪৮] সুনানে আবু দাউদ : ৩৫৪৪

ন্যায়বিচারের একটি স্বর্ণালি ঘটনা

আলি (রা.) তখন খলিফা। তাঁর একটি ঢাল হারিয়ে যায়। আর সেটি খুঁজে পাওয়া যায় এক ইহুদির কাছে। তিনি ইহুদিকে ধরে নিয়ে যান বিচারক কাজি শুরাইহ ইবনে আল হারিস (রহ.)-এর কাছে। ঢালটি যে আলি (রা.)-এর ছিল, সেটার সাক্ষী ছিলেন দুজন। একজন তাঁর পুত্র হাসান (রা.), আরেকজন তাঁর দাস কানবার।

বিচারক কানবারের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, কিন্তু বাবার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন না। কারণ, স্বজনপ্রীতির জায়গা থেকে এটা করা হয়নি। আলি (রা.) বিচারের রায়ে হেরে যান।

ইহুদি দেখল একজন খলিফা হওয়া সত্ত্বেও আলি (রা.) পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন না করায় রায় তাঁর বিপক্ষে গেল। তিনি বুঝে গেলেন ইসলামের ন্যায়বিচারের গুরুত্ব। বিচারকের রায়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ঢালটি আলি (রা.)-কে ফিরিয়ে দেন। অন্যদিকে আলি (রা.) আবার খুশি হয়ে নওমুসলিমকে ঢালটি উপহার দেন।[২৪৯]

খুলাফায়ে রাশেদিন এত সম্মানিত; কারণ তাঁরা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। তাঁদের যুগটি সর্বোত্তম, তাঁরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আমরাও যেন আমাদের জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারি। একজন মুমিন হিসেবে এটা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

---

[২৪৯] আব্দুল মাবুদ, *তাবেয়িদের জীবনকথা* : ১/১৮৮-১৮৯

সম্পর্ক জোড়া লাগানো

মুমিন ব্যক্তিত্বের অনন্য একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগানো, যা পরিবার ও সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোতে মাঝেমধ্যে টানাপোড়েন দেখা দেয়। সম্পর্ক ভেঙে যায়। ভাই ভাইয়ের সাথে কথা বলে না। বোন বোনের সাথে কথা বলে না। এক আত্মীয় আরেক আত্মীয়ের সাথে কথা বলে না। তাদের বাসায় বেড়াতে যায় না।

ইসলামি শরিয়াহ আমাদের উৎসাহ দেয়, এমনটি হলে আমরা যেন নিজ থেকেই এগিয়ে যাই। সম্পর্ক জোড়া লাগানোর ব্যবস্থা নিই। ইসলাম আমাদের এসব ক্ষেত্রে বসে থাকতে নিরুৎসাহিত করে।

আপনি লোকজনকে গিয়ে বলছেন, আমার চাচা আর চাচাতো ভাই কথা বলে না। আমার ফুফাতো ভাই আর আমার ভাইয়ের মধ্যে সমস্যা, তারা কথা বলে না। এই বলাবলির মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। আপনার দায়িত্ব হলো, কী করলে তারা কথা বলবে, সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে সেটা নিশ্চিত করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যদি মুমিনদের দুটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।'[২৫০]

এখানে 'দুই দল' হতে পারে দুটি গোত্র, দুটি দেশ, দুটি জাতি, দুটি পরিবার; এমনকি দুজন ব্যক্তি। যখনই তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে, আপনার কাজ : দর্শক হয়ে সেটা উপভোগ না করে তাদের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেওয়া। গোপনে বৈঠক করা সাধারণত খারাপ। তবে তিনটি ক্ষেত্রে গোপন বৈঠক প্রশংসনীয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোনো কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে) যে নির্দেশ দেয় সাদাকার, ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে; অচিরেই আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব।'[২৫১]

---

[২৫০] সূরা হুজুরাত : ৯

[২৫১] সূরা নিসা : ১১৪

বেশির ভাগ গোপন বৈঠকের খারাপ উদ্দেশ্যে থাকে। তবে আল্লাহ তিন ধরনের গোপন বৈঠকের প্রশংসা করেছেন; যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সম্পর্ক জোড়া লাগানো।

আপনার দুজন কাজিন পরস্পর কথা বলে না। আপনি অন্য কাজিনদের সাথে মিলে গোপনে বৈঠক করলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, সবাইকে নিয়ে একটি পিকনিকে যাবেন। আর যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো ওই দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য দূর করে সম্পর্কের মীমাংসা করা। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর তরফ থেকে গোপন বৈঠক প্রশংসনীয়।

মানুষের মাঝে সম্পর্ক ঠিক করে দেওয়াটাও ইবাদত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা নামাজ, রোজা, সাদাকার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরিও বটে। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেন—আমি কি তোমাদের নামাজ, রোজা ও সাদাকার চেয়ে উত্তম কাজ সম্পর্কে বলব না? সাহাবিরা জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বলুন। নবিজি বলেন, পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন। কেননা, পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অর্থ হলো দ্বীনের বিনাশ হওয়া।[২৫২]

এসব আমল নিয়ে সাধারণভাবে যেভাবে কথা বলা দরকার, প্রচার হওয়া দরকার—আমরা সেভাবে বলি না। আমরা মনে করি, ইসলাম আমাদের আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা করতে বলে। কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবতে বলে। কথাটা সত্য হলেও সকল ক্ষেত্রে তো আর এই কথা প্রযোজ্য না। আপনি অন্যকে নিয়েও ভাববেন, যদি হয় সেটা কল্যাণের উদ্দেশ্যে।

অন্যরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে আপনি মিটিয়ে দেবেন। কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করলে আপনি সেটা জোড়া লাগানোর ব্যবস্থা করবেন। নবিজি জানান, সেই কাজটি নামাজ-রোজার চেয়েও উত্তম।

আমরা যদি আসলেই সবাইকে ভালোবাসি, তাহলে কারও সম্পর্কচ্ছেদ আমরা পছন্দ করব না। এগিয়ে যাব সম্পর্ক জোড়া লাগাতে।

নবিজি মসজিদে খুতবা দিচ্ছেন। তাঁর আদরের নাতি হাসান (রা.)-কে মসজিদে দেখে কোলে নেন। আর তাঁকে নিয়েই খুতবা দেন। তখন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমার এই নাতি নেতা হবে এবং সম্ভবত আল্লাহ তাঁর দ্বারা মুসলমানদের দুটি বড়ো দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবেন।[২৫৩]

নবিজি জানিয়ে দেন, হাসান (রা.) নেতা হবেন। আর সত্যই তা আমরা ইতিহাস খুললে দেখতে পাই, যখন মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফত দাবি করেন।

---

[২৫২] জামে আত-তিরমিজি : ২৫০৯

[২৫৩] সহিহ বুখারি : ২৭০৪

অন্যদিকে খিলাফতের দাবিদার ছিলেন হাসান (রা.)। মুয়াবিয়ার কৃত দাবির সংবাদ পেয়ে তিনি নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নেন। এর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যকার আবশ্যিক সংঘাত এড়ানো যায়। হাসান (রা.) এজন্যই নেতা, তিনি উম্মাহর প্রয়োজনে তাঁর যৌক্তিক দাবি প্রত্যাহার করেন। সন্ধি স্থাপনে, সম্পর্ক রক্ষার জন্য নিজের দাবি থেকে সরে আসেন।

নবিজির সিরাত পড়লে পাওয়া যায়, তিনি অসংখ্যবার মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক জোড়া লাগান। একবার তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে গিয়ে দেখেন আলি (রা.) তাঁর মেয়ের ওপর রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। তিনি মসজিদে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। নবিজি এমনটি মনে করেননি—এসব তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, তোমরাই ঠিক করো। তিনি বরং মসজিদে যান, আলি (রা.)-এর অভিমান ভাঙানোর জন্য তাঁকে সুন্দর একটি নামে ডাকেন, হে আবু তুরাব।[২৫৪]

নবিজি দেখতে পান, মদিনার অলিগলিতে এক যুবক পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কপোল বেয়ে পড়ছে অশ্রু-নিনাদ। যে-ই তাঁকে এভাবে দেখছে, অন্তর গলে মায়াময় অনুভূতি নিয়ে পাশ অতিক্রম করে যাচ্ছে। মদিনার সমাজ, যেখানে নবিজি আছেন, সেই সমাজের একজন যুবক একটা মেয়ের জন্য এইভাবে কেঁদে বেড়াচ্ছে!

তাঁর নাম মুগিস। তিনি ছিলেন নবিজির সাহাবি এবং একজন দাস। বারিরা নামের এক মেয়ের পিছু পিছু তিনি ঘুরছেন। বারিরা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁরা ছিলেন দুজনই দাস-দাসী। দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাদের বিবাহিত সম্পর্ক বজায় রাখবেন কি না, সেটা তাদের এখতিয়ার। মুগিস বিয়ের সম্পর্ক বহাল রাখতে চাইলেন, কিন্তু বারিরা চাইলেন না।

বারিরা মুগিসকে তালাক দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু বারিরার চলে যাওয়া কোনোভাবেই মুগিস মেনে নিতে পারেননি। বাচ্চা, আনাড়ি ছেলেদের মতো বারিরার পিছু পিছু ঘুরছেন। অঝোরে কান্না করতে করতে তাঁর দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেছে।

মুগিসকে এই অবস্থায় দেখে নবিজিরও মায়া হলো। মুগিসের আবেগ তিনি অনুভব করলেন। তাঁর সাথে থাকা আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ও আব্বাস! বারিরার প্রতি মুগিসের ভালোবাসা এবং মুগিসের প্রতি বারীরার অনাসক্তি দেখে কি তুমি আশ্চর্যান্বিত হও না?

---

[২৫৪] সহিহ বুখারি : ৪৪১

মুগিসের এমন পাগল-কান্না দেখে নবিজি তাঁর পক্ষ নিয়ে বারিরার কাছে গেলেন। তাকে বললেন, তুমি যদি তাঁর কাছে আবার ফিরে যেতে...

বারিরা ছিলেন বেশ বুদ্ধিমতী। তিনি নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন? নবিজি তাঁর কথাটি পরিষ্কার করেন—না, আমি আমার পক্ষ থেকে তার জন্য কেবল সুপারিশ করছি। বারিরা যখন বুঝলেন এটা নবিজির নির্দেশ না। চাইলে তিনি নিজের মতের ওপর অটল থাকতে পারেন। বারিরা বললেন, আমি তাঁকে (মুগিসকে) চাই না।[২৫৫]

নবিজি মানবিক জায়গা থেকে তাঁদের মিলিয়ে দিতে এলেন। মুগিসের পক্ষ হয়ে বারিরার কাছে সুপারিশ করলেন। কিন্তু বারিরা সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ফলে নবিজি আর জোরাজুরি করেননি।

সাধারণত মিথ্যা বলা নিষেধ। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাকে ইসলাম সমর্থন করে, তন্মধ্যে একটি হলো সম্পর্ক জোড়া লাগানো। দুজন ব্যক্তির মাঝে যদি সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দেয়, তারা একে অপরের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়, তাহলে তাদের এক করে দিতে আপনি মিথ্যা বলতে পারেন।

যেমন : দুজন মানুষের মধ্যে যদি মন কষাকষি হয়, তাদের একত্র করার জন্য প্রয়োজনে মিথ্যা বলতে পারেন। একজনকে বলতে পারেন, অমুক তো তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে অনুতপ্ত, সে আমাকে বলল—তোমার সাথে কথা বলতে চায়। আবার অন্যজনকে গিয়ে বলুন—অমুক সেদিন যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, এটার জন্য পরে কষ্ট পেয়েছে। সে তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। চলো তার সাথে গিয়ে কথা বলি। এসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতে কোনো অসুবিধা নেই। নবিজি বলেন—সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে মানুষের মাঝে আপসের মাধ্যমে সমাধা করে দেয়। সে কল্যাণের জন্যই মিথ্যা বলে এবং কল্যাণের জন্যই চোখলখুরি করে।[২৫৬]

মানুষের মধ্যে সম্পর্ক জোড়া লাগাতে মিথ্যা বলা পর্যন্ত অনুমোদিত। এ থেকে স্পষ্ট হয়—একটি সম্পর্ক ঠিক করা, আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ইসলামে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রসিদ্ধ একজন আলিম বলেন, সত্য বলে সম্পর্ক ছিন্ন করা আল্লাহ অপছন্দ করেন। কিন্তু মিথ্যা বলে সম্পর্ক জোড়া লাগানো আল্লাহ পছন্দ করেন।

---

[২৫৫] সহিহ বুখারি : ৫২৮৩

[২৫৬] সহিহ মুসলিম : ৬৫২৭

সমাজে যদি এই আখলাক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে অসংখ্য সম্পর্ক জোড়া লেগে যাবে। মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য হলে সেটা মিটে যাবে। কারণ, এর ফলে অন্যরা উদ্যোগ নেবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপস ও মীমাংসা করে দাও।'[২৫৭]

[২৫৭] সূরা হুজুরাত : ১০

ক্ষমাশীলতা

ক্ষমাশীলতা মুমিন ব্যক্তিত্বের অন্যতম গুণ। মুমিন আল্লাহর ক্ষমা পেতে চায়, ক্ষমা পাওয়ার জন্য অন্যকেও ক্ষমা করে। সে যেমন চায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তেমনই সে অন্যের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

> 'তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান; যা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।'[১৫৮]

এরপরের আয়াতেই আল্লাহ জানিয়ে দেন মুত্তাকি কারা। তিনি বলেন—

ক. যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে।

খ. রাগ সংবরণ করে এবং

গ. মানুষকে ক্ষমা করে।[১৫৯]

যারা জান্নাত লাভ করবে, তাদের অন্যতম গুণাবলি হলো—তারা মানুষকে ক্ষমা করে। কেউ একজন এমন একটি কাজ করল, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তা ক্ষমার অযোগ্য, তখন যদি সে তাকে ক্ষমা করে দেয়। এই ক্ষমার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

মানুষকে তখনই ক্ষমা করা হয়, যখন সে আপনার সাথে কোনো অন্যায় করে। অন্যায় না করলে আর তো ক্ষমার প্রশ্নই আসে না। কেউ এমন কিছু করেছে, যা আপনি অপছন্দ করেন বা আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। তখন তার ওপর প্রচণ্ড রাগ অনুভূত হবে। এখন যদি তাকে ক্ষমা করতেই হয়, সেই মুহূর্তে নিজের রাগ সংবরণ করে ক্ষমা করতে হবে।

আপনার অধিকার ছিল তাকে শাস্তি দেওয়ার; শরিয়াহ ও সামাজিক আইনের আলোকে। কিন্তু আপনি তাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন। এটাই হলো ক্ষমাশীলতা। মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

---

[১৫৮] সূরা আলে ইমরান : ১৩৪

[১৫৯] সূরা আলে ইমরান : ১৩৫

'যখন রাগান্বিত হয়, তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।'[২৬০]

সাধারণত মানুষ যখন রাগান্বিত হয়, তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সে অন্যকে শাস্তি দেয়। স্বভাবজাত মানুষ রাগের সময় ক্ষমা করতে পারে না! কিন্তু আল্লাহ মুমিনের গুণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তারা রাগান্বিত অবস্থায়ও ক্ষমা করে দেয়।

কেউ যদি আপনাকে রাগিয়ে ফেলে আপনার সাথে মন্দ আচরণ করে, তাহলে প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আপনার আছে। আপনি চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। যতটুকু অপরাধ সে করেছে, ততটুকুর শাস্তি দেওয়ার জন্য আইন আপনার পক্ষে আছে। তবে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না।'[২৬১]

আল্লাহ এখানে দুটি নিয়মের কথা বলেন।

প্রথমত, কেউ আপনার সাথে মন্দ আচরণ করলে আপনি অনুরূপ তার সাথে মন্দ আচরণ করতে পারেন। কেউ আপনাকে থাপ্পড় মারলে আপনি অনুরূপ তাকে থাপ্পড় মারতে পারেন। কিন্তু এই অনুরূপ কাজকেও আল্লাহ তায়ালা 'মন্দ কাজ' বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, অথবা আপনি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আপনার অধিকার ছিল তাকেও অনুরূপ বলার। তার সাথে অনুরূপ আচরণ করার। কিন্তু আপনি মন্দের দিকে না ধাবিত হয়ে উত্তমের দিকে এগিয়ে গেলেন। আপনি তাকে ক্ষমা করে দেন। ফলে আল্লাহ বলছেন, এজন্য আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। কিন্তু কী পুরস্কার দেওয়া হবে সেটা আল্লাহ বলেননি। তার মানে আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

সর্বোত্তম ক্ষমা হলো নিজের পরিবারের সদস্যদের ক্ষমা করে দেওয়া। প্রতিদিনই নানান কারণে আমরা পরিবারের সদস্যদের সাথে রাগারাগি করি। এমনও হয় আত্মীয় আরেক আত্মীয়ের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। এসব ক্ষেত্রে যদি একপক্ষ ক্ষমাশীল আচরণ করতে পারে, তাহলে সম্পর্ক জোড়া লেগে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে মুমিনগণ! তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদেরই শত্রু। অতএব, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন

---

[২৬০] সূরা শুরা : ৩৭

[২৬১] সূরা শুরা : ৪০

করো। আর যদি তোমরা মার্জনা করো, এড়িয়ে যাও এবং ক্ষমা করো; তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।'[২৬২]

নবিজি তিনটি বিষয়ের কথা বলেন, যেগুলো সম্পর্কে আমরা একধরনের ধারণা পোষণ করি, বাস্তবে সেগুলো ভিন্ন রকম। আমরা মনে করি, দান করলে সম্পদ কমে। ক্ষমা করলে মর্যাদা কমে। বিনয়ী হলে সম্মান কমে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ বলেন—এসব অমূলক ধারণা, একটিও ঠিক নয়। তিনি বলেন—

ক. দান করলে সম্পদ কমে না।

খ. যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং

গ. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করেন।[২৬৩]

অর্থাৎ, যে ক্ষমা করে সে দুর্বল নয়; বরং সে তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী, যে প্রতিশোধ নেয়। প্রতিশোধ নেওয়া কোনো গুণ না, কিন্তু অন্যকে ক্ষমা করে দেওয়া একটি অনন্য গুণ। আয়িশা (রা.) নবিজির একটি গুণ বর্ণনা করেন, নবিজি নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিশোধ নিতেন।[২৬৪]

নবিজির পুরো জীবনী পড়লে ক্ষমাশীলতার অসংখ্য উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বন্ধু-শত্রু সবাইকে ক্ষমা করে দিতেন। তায়েফবাসী, যারা তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল, তাদেরও ক্ষমা করে দেন। মক্কা বিজয়ের দিন মক্কাবাসীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

তবে একটি জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন। ক্ষমা করে দেওয়ার মানে এই না যে, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। আপনি যদি কাউকে ক্ষমা করেন, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই, আপনি তার অন্যায়কে অন্যায় মনে করেননি।

অন্যায় অন্যায়ই থেকে যাবে। আপনি কাউকে ক্ষমা করার মানে হলো আপনি তার মতো আচরণ করলেন না, তার চেয়ে উত্তম আচরণ করলেন। ক্ষমা করে দিয়ে উত্তম আচরণ করলে দেখবেন, মানসিক প্রশান্তি অনুভূত হবে। সাইকোলজিস্টরা বলেন, মানসিক প্রশান্তি সহজে হাসিলের অন্যতম উপায় হলো নিঃসংকোচে কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া।

---

[২৬২] সূরা আত-তাগাবুন : ১৪

[২৬৩] সহিহ মুসলিম : ৬৪৮৬

[২৬৪] সহিহ বুখারি : ৩৫৬০

ইসলামি শরিয়াহ ক্ষমাশীলতাকে উৎসাহিত করে। তার মানে এই নয়, ক্ষমা করা ওয়াজিব বা করতেই হবে কিংবা আবশ্যক। মাঝেমধ্যে আবার ক্ষমা করতে না পারাটাও বরং উত্তম। যেমন : কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে কটূক্তি করলে আপনি তাকে বলতে পারবেন না, ক্ষমা করে দিলাম। ক্ষমাশীলতার একটি সীমানা আছে। সীমানা বুঝে ক্ষমা করতে হবে। যদি এমন হয়—কাউকে ক্ষমা করার ফলে সে পাপের সুযোগ পাচ্ছে, সরলতা মনে করছে, তখন তাকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এসব ক্ষেত্রে পাঁচটি অপশন আছে। সেগুলো হলো—

• কেউ আপনার ক্ষতি করল, প্রতিশোধস্বরূপ আপনিও তার কয়েক গুণ ক্ষতি করলেন। কেউ আপনাকে একটি কটু কথা বলল, আপনি তাকে ১০টি কটু কথা বললেন। কেউ অসাবধানতাবশত আপনার সঙ্গে ধাক্কা খেলো, আপনি তাকে ধরে হাত-পা ভেঙে দিলেন। এসব জঘন্য কাজ, এই ধরনের কাজ হারাম।

• কেউ আপনার যেমন ক্ষতি করল, আপনিও তার তেমন ক্ষতি করলেন। এটা ইসলামে অনুমোদিত। কেউ আপনার ক্ষতি করলে আপনি তার জন্য বদদুআ করতে পারেন। নবিজিকে মক্কার কাফিররা যখন শারীরিক নির্যাতন করেছে, তিনি তখন তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেন। যাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেন, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়।[২৬৫]

• আপনার ওপর কেউ জুলুম করলে আপনি দুনিয়াতে তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন তার নেক আমলের বিনিময় গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ, আপনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে বিচার দিলাম। কিয়ামতের দিন তোমাকে দেখে নেব। এটাও ইসলামে অনুমোদিত। যেসব অত্যাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে তেমন কিছু করতে পারবেন না কিংবা তাদের ক্ষমতার প্রাচুর্যের কাছে আপনি অসহায়, তাহলে এমনটা করতে পারেন।

• আপনি তাকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন না। এটাও ইসলামে অনুমোদিত। উহুদ যুদ্ধে নবিজির চাচা হামজা (রা.)-কে শহিদ করে ওয়াহশি। যদিও তিনি পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর নবিজির তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হামজা (রা.)-এর শাহাদাতের কথা। ওয়াহশি (রা.) সেটা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ তাঁকে বলেন, আমার সামনে থেকে কি তোমার চেহারা সরিয়ে রাখতে পারো?[২৬৬]

নবিজি তাঁকে ক্ষমা করলেও তাঁর আচরণটি ভুলতে পারেন না। ফলে তিনি ওয়াহশির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেননি। এ সরকম ক্ষেত্রে কেউ যদি আপনার

---

[২৬৫] সহিহ বুখারি : ৩৮৫৪

[২৬৬] সহিহ বুখারি : ৪০৭২

কাছে ক্ষমা চায়, আর যদি কাউকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে তার বিনিময়ে আপনি সওয়াব পাবেন।

• আপনি ক্ষমা করে দেবেন এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। এটা হলো ক্ষমাশীলতার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

মিসতা ইবনে সালামা (রা.)-এর মা উম্মে মিসতা (রা.)। উম্মে মিসতা ছিলেন আবু বকর (রা.)-এর খালা। সেই হিসেবে মিসতা আবু বকর (রা.)-এর খালাতো ভাই। আবু বকর (রা.) তাঁর সম্পূর্ণ ভরণপোষণ দিতেন।

বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুনাফিকরা আয়িশা (রা.)-কে অপবাদ দেয়। অপবাদের গুজব রটে যায় পুরো মদিনাজুড়ে। মুনাফিকদের প্ররোচনায় পড়ে কয়েকজন সাহাবিও এর সাথে তাল মেলাতে শুরু করেন। তাঁরাও আয়িশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন!

অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসতা ইবনে সালামা (রা.)। আবু বকর (রা.) যাকে আর্থিক সাহায্য করেন, সেই ব্যক্তিই কিনা তাঁর মেয়ের চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটনা করেন, অপবাদ বলে বলে বেড়ান!

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আয়িশা (রা.)-এর চারিত্রিক নিষ্কলুষতার ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেন। সবাই বুঝতে পারলেন, আয়িশা (রা.) সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল এটা স্রেফ অপবাদ; এর মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। আয়াত নাজিল হওয়ার পর আবু বকর (রা.) মিসতা (রা.)-এর ব্যাপারে বলেন, আল্লাহর কসম! মিসতা যেহেতু আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে অপবাদ রটিয়েছে, তাই আমি তাঁর জন্য কখনো কিছু খরচ করব না!

যে ব্যক্তিকে আবু বকর (রা.) আর্থিক সাহায্য করেন, সেই ব্যক্তিই তাঁর মেয়ের বদনাম করেছে! আবু বকর (রা.)-এর এমন প্রতিক্রিয়া দেখানো তো খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মানুষ যেন শ্রেষ্ঠ আচরণ করেন। আল্লাহ নিজেই ক্ষমাশীল। মানুষও যেন এই ক্ষমাশীলতার গুণটি আয়ত্ত করতে পারে। তাই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা আয়াত নাজিল করেন—

> 'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ না গ্রহণ করে—তাঁরা আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহ ত্যাগ করেছে, তাঁদের কিছুই দেবে না। তাঁরা যেন ওদের ক্ষমা এবং ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[২৬৭]

---

[২৬৭] সূরা নুর ২৪ : ২২

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে—যাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না, কোনোভাবেই যাকে ক্ষমা করা যায় না, তাঁর ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালা বলছেন—'তাঁকে ক্ষমা করে দাও।' ক্ষমা করে দিলে কী হবে? তারপরই আল্লাহ পালটা প্রতিদানের কথা দিয়ে বলছেন, এতে করে আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আবু বকর (রা.) আল্লাহর এমন ঘোষণা শুনে বললেন—আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন, এটা আমি পছন্দ করি। যেই মিসতাকে তিনি আর সাহায্য করবেন না বলেছিলেন, আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘোষণা শুনে তাঁকে আগের মতো আর্থিক সাহায্য করা শুরু করেন। তখন তিনি পালটা কসম করেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর খরচ দেওয়া কখনোই বন্ধ করব না।[২৬৮]

আবু বকর (রা.) তাঁর মেয়ের ওপর অপবাদ রটনাকারীকে ক্ষমা করে দেন। এ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আমরাও চাইলে ক্ষমা করতে পারি। আমাদের প্রতি কেউ কি এমন অন্যায় করে, যা আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে বেশি? ক্ষমাপ্রদর্শন করে আমরা উত্তম আচরণ করতে পারি। আর অন্যকে ক্ষমা করব এজন্যই, যাতে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করেন। নবিজি আমাদের এর প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন—অন্যকে ক্ষমা করো, (তাহলে) আল্লাহ তোমাকেও ক্ষমা করবেন।[২৬৯]

---

[২৬৮] সহিহ বুখারি : ৬৬৭৯

[২৬৯] মুসনাদে আহমাদ : ৬৫৪১

মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ

ব্যক্তিত্বপূর্ণ এই গুণের প্রতি উৎসাহ দিয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অনেকগুলো আয়াত নাজিল করেন। তিনি বলেন—

> 'জমিনে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনো জমিনে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায়ও কখনো পাহাড় সমান পৌঁছাতে পারবে না।'[২৭০]

আল্লাহ আরও জানিয়ে দেন, আমরা যেন সম্মানজনক পদ্ধতিতে হাঁটাচলা করি। এমনভাবে না হাঁটি, যেন হাঁটার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়। আবার এমনভাবেও যেন না হাঁটি, লোকজন আমাদের দুর্বল ভাবে। কুরআনের আরেকটি আয়াতে দেখা যায় লুকমান (আ.) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছেন—

> 'আর তোমরা চলার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। তোমাদের আওয়াজকে নিচু করো। নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।'[২৭১]

আমরা যখন কথা বলব, এত জোরে কথা বলব না আবার খুব আস্তেও কথা বলব না। আল্লাহ তায়ালা গাধার উদাহরণ দিয়ে বলেন, গাধার আওয়াজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আমাদের আওয়াজ যেন এমন না হয়।

কথা বলা, চলার ক্ষেত্রে যেমন মর্যাদাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করতে হবে, তেমনই ইবাদতের ক্ষেত্রেও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। একবার নবিজি নামাজ পড়াচ্ছিলেন। কয়েকজন সাহাবি মসজিদে এলেন একটু দেরি করে। নামাজের রাকাত পাওয়ার জন্য তারা দৌড়ে মসজিদে আসেন। নামাজ শেষে নবিজি সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, নামাজের জন্য ইকামত দেওয়া হয়ে গেলে তোমরা দৌড়াদৌড়ি বা তাড়াহুড়ো করে নামাজে এসো না; বরং প্রশান্তিসহ গাম্ভীর্যতা বজায় রেখে নামাজে শরিক হও। অতঃপর ইমামের সাথে যত রাকাত নামাজ পাও, তা আদায় করো। আর যতটুকু না পাবে, তা পূরণ করে নাও।

---

[২৭০] সূরা বনি ইসরাইল : ৩৭

[২৭১] সূরা লুকমান : ১৯

কেননা, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাজ আদায়ের সংকল্প করে, তখন সে নামাজরত অবস্থায় থাকে বলে গণ্য হয়।[২৭২]

আমরা এখনও দেখতে পাই, মানুষ নামাজে জামাত পাওয়ার জন্য দৌড়ে দৌড়ে মসজিদে আসে, যা দেখতে খুব বিদঘুটে দেখায়। এটা সুন্নত না। সুন্নত হলো—ধীরে-সুস্থে, গাম্ভীর্যতা বজায় রেখে যাওয়া।

হজের সময় নবিজি আরাফা থেকে মুজদালিফায় যাচ্ছেন। তখন পেছন থেকে খুব বেশি হাঁকডাক ও উট পেটানোর শব্দ শুনতে পেলেন। সাহাবিরা খুব দ্রুতগতিতে উট হাঁকাচ্ছেন। নবিজি তাঁদের দিকে চাবুক উঠিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, হে লোকসকল! তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করো। কেননা, উট দ্রুত হাঁকানোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।[২৭৩]

ধীরস্থিরতা অবলম্বন করলে ভিন্ন রকম এক প্রশান্তি পাওয়া যায়। ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাড়াহুড়ো করতে বলেননি। আমরা যেন ধীরে-সুস্থে ইবাদত করি, তাহলে অন্যের ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটবে না।

'সাকিনা' নাজিল হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। মুমিনের হৃদয়ে সাকিনা প্রদান করেন। সিরাত অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, যেকোনো দুর্যোগের মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা সাহাবিদের অন্তরে সাকিনা নাজিল করেন। যেমন : হুনাইন যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'তারপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাজিল করলেন তাঁর রাসূলের ওপর ও মুমিনদের ওপর।'[২৭৪]

বাইয়াতুর রিদওয়ানের সময়ও আল্লাহ সাকিনা নাজিল করেন। তিনি বলেন—

> 'মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তাদের অন্তরে যা ছিল তা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন, তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি।'[২৭৫]

মক্কা বিজয়ের কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যখন কাফিররা তাদের অন্তরে জাহেলি যুগের অহমিকা পোষণ করেছিল। তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর এবং মুমিনদের ওপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাজিল করলেন।'[২৭৬]

---

[২৭২] সহিহ মুসলিম : ১২৪৭
[২৭৩] সহিহ বুখারি : ১৬৭১
[২৭৪] সূরা আত-তাওবা : ২৬
[২৭৫] সূরা ফাতহ : ১৮

মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিমদের প্রতি যদি আল্লাহ প্রশান্তি নাজিল না করতেন, তাহলে হয়তো বেশ কিছু হত্যাযজ্ঞ ঘটে যেত। কারণ, মক্কাবাসীর অত্যাচারের কারণে সাহাবিরা হিজরত করেছেন। এখন বিজয়ীর বেশে তারা মক্কায় ফেরেন। তারা চাইলে মক্কাবাসীকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ নবিজি ও সাহাবিদের ওপর আল্লাহ সাকিনা নাজিল করেন।

মর্যাদাপূর্ণ আচরণের দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো শরয়ি দিক, অন্যটি সাংস্কৃতিক। যেমন : ইসলামি শরিয়াহ বলে—আমরা গালাগালি করতে পারব না, কটু কথা বলতে পারব না, মিথ্যা বলতে পারব না ইত্যাদি। পৃথিবীর যে দেশেই আপনি থাকুন না কেন, এগুলো মেনে চলতে হবে।

আবার কিছু দিক আছে সাংস্কৃতিক। যেমন : ভাষা, শব্দ। এক অঞ্চলের খুবই সম্মানজনক ভাষা, আরেক অঞ্চলে সেটা হয়তো তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্য বলা হয়ে থাকে—এক দেশের গালি, আরেক দেশের বুলি।

আপনি যেখানে বসবাস করেন, সেখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনার পর্যাপ্ত জানাশোনা থাকতে হবে, বোঝাপড়া থাকতে হবে। যেমন : কাপড় পরার ক্ষেত্রে। পৃথিবীর একেক দেশের মুসলিম অধিবাসী একেক ধরনের পোশাক পরেন। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমগণ একধরনের পোশাক পরেন, মধ্যপ্রাচ্য-আরবের মুসলিমগণ আরেক ধরনের পোশাক। উপমহাদেশের মুসলিমগণ একধরনের পোশাক পরেন, ইউরোপ-আমেরিকার মুসলিমগণ আরেক ধরনের পোশাক।

আর উপমহাদেশের মুসলিমরা সাধারণত পাঞ্জাবি, ফতোয়া, শার্ট পরে। অন্যদিকে আরবের মুসলিমরা জোব্বা পরে। আমেরিকা থাকাকালীন যে পোশাক পরে আমি জুমার নামাজে যেতাম, সৌদি আরব দেখি এমন পোশাক পরে তারা কেউ জুমায় আসে না; এমন পোশাক নাকি তারা বাসায় পরে।

আপনি এসব ক্ষেত্রে সেই পোশাক পরুন, যে পোশাকটি আপনার অঞ্চলের মুসলিমরা পরে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন—সেই পোশাকের সাথে ইসলাম পোশাকের ব্যাপারে যে নির্দেশনা দিয়েছে, তার সাথে যেন সাংঘর্ষিক না হয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহর মতে, সুন্নাতসম্মত পোশাক হলো আপনার এলাকার লোকজনের মতো করে পোশাক পরা; যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পোশাক পরতে শরিয়াহ অনুমোদন দেয়।

---

[২৭৬] সূরা ফাতহ : ২৬

একবার এক লোক নবিজির কাছে আসেন। তার পোশাক ছিল জীর্ণ, আর জায়গায় জোড়াতালি দেওয়া। নবিজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি অর্থ নেই? তিনি জানালেন, তার কাছে অর্থ আছে।

নবিজি বুঝতে পারলেন, টাকাকড়ি থাকা সত্ত্বেও লোকটি ভালো পোশাক পরে না। এমন কাজ আমাদের আশপাশের অনেকেই করে। তারা মনে করে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জোড়াতালি দেওয়া জামা পরই উত্তম। এই ধারণা ঠিক নয়। নবিজি লোকটিকে বলেন—আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তখন তার (নিয়ামতের) নিদর্শন তার মধ্যে দেখতে পছন্দ করেন।[২৭৭]

একজন মুসলিম এমন কোনো পোশাক পরতে পারে না, যা দেখে লোকজন বলে—এই দেখো, ও কী পরেছে! একজন মুসলিম এমনভাবে কথা বলতে পারে না, যা তার জন্য অসম্মান বয়ে আনে। একজন মুসলিম এমন কাজ করতে পারে না, যা তার নিজের জন্য এবং মুসলিম জাতির জন্য লজ্জাজনক। মুসলিম সব সময় সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখে জীবনযাপন করে। তার হাঁটাচলা, কথা বলা, চুপ থাকা, জামা পরা—সবকিছু হতে হবে গাম্ভীর্যপূর্ণ, সম্মানজনক। যতটুকু সামর্থ্য আছে, সামর্থ্য যেন তার যাপিত জীবনের সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কারণ, আল্লাহ তাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, সেই নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ দেখতে আল্লাহ পছন্দ করেন।

---

[২৭৭] বুলগুল মারাম : ৫৩০

দানশীলতা

মুমিন ব্যক্তিত্বের দানশীলতার এই গুণকে 'আখলাকের রানি' বলা যায়। অন্যকে এমনভাবে দান করতে হবে, তার কাছ থেকে কোনো কিছু আশা করা যাবে না। দান করার পর আশা করতে হবে আল্লাহর কাছে। এর বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে দান করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আনসারদের প্রশংসা করেন। তারা মুহাজিরদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিল, খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। তিনি বলেন—

> 'আর মুহাজিরদের যা প্রদান করা হয়েছে, তার জন্য তারা (আনসার) তাদের অন্তরে ঈর্ষা অনুভব করে না। নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয়।'[২৭৮]

আমরা যখন কোনো কিছু দান করি, মনে মনে বলি—টাকাটা থাকলে এটা কিনতে পারতাম। দান করার পরও টাকার প্রতি একধরনের আকর্ষণ থেকে যায়। কিন্তু আনসারদের ব্যাপারটি ছিল পুরোপুরিই ভিন্ন। তাঁরা হাত দিয়ে যেমন দান করে, মন দিয়েও তারা ঢেলে দান করে। ফলে দান করার পর তাঁদের মনের মধ্যে কোনো অশান্তি ছিল না, আফসোস ছিল না!

তাঁরা নিজেরা অভাবগ্রস্ত ছিলেন। নিজেদের এমন অভাব থাকা সত্ত্বেও মুহাজির ভাইদের দান করেন। ধরুন, আজকে আপনার বাসায় বিরিয়ানি রান্না হয়েছে। অনেক দিন ধরে আপনি বিরিয়ানি খান না। কিন্তু রান্নার পর পুরো খাবারটি অন্যকে দিয়ে দিলেন। দেওয়ার পর আপনার মনে কোনো আফসোস নেই, একবারের জন্যও মনে হলো না, ইশ! একটু যদি খেয়ে দেখতাম। আনসারদের দান ছিল ঠিক এমন।

এই আয়াত থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়।

- মন থেকে দান করা এবং
- আপনার কাছে যা পছন্দনীয়, তা দান করা।

---

[২৭৮] সূরা হাশর : ৯

পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না; যতক্ষণ না তা থেকে ব্যয় করবে, যা তোমরা ভালোবাসো।'[২৭৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবি ছিলেন আবু তালহা। তিনি ছিলেন আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর সৎ-বাবা। এ আয়াতটি শোনার পর আবু তালহা (রা.) নবিজির কাছে যান। গিয়ে বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! মসজিদে নববির পাশে 'বায়রুহা' নামক বাগানটি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

আবু তালহা (রা.)-এর অনেকগুলো বাগান ছিল। তার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাগান বায়রুহা। উল্লেখ্য, সাহাবিরা তাঁদের পোষা প্রাণী; এমনকি বাগানগুলোর নামকরণ করতেন। নবিজিও পোষা প্রাণীর নাম রাখতেন।

আপনি যদি মসজিদে নববির পেছনের দরজা কিং ফাহাদ গেইট দিয়ে প্রবেশ করেন, সেখান থেকে বামদিকে ১৫০ ফুট হাঁটেন, দেখতে পাবেন বায়রুহা বাগানটি। আবু তালহা (রা.) তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। তিনি বলেন—এটা আল্লাহর নামে সাদাকা করা হলো, আমি এর দ্বারা কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই, আপনি যাকে দান করলে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব হয় তাকেই দান করুন।

নবিজি আবু তালহার দানকে স্বাগত জানালেন। তিনি বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ। এটা হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এটা হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও।'[২৮০]

পবিত্র কুরআনের প্রথম দিকের নাজিল হওয়া একটি সূরায় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রশংসা করেন। কেননা, তারা নিজের খাবার অনাহারির মুখে বিলিয়ে দেয়; যদিও ওই খাবারের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বলেন—

> 'তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করে।'[২৮১]

আর খাবার দেওয়ার পর তারা জানিয়ে দেয়—

> 'আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি। তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও কামনা করি না।'[২৮২]

---

[২৭৯] সূরা আলে ইমরান : ৯২

[২৮০] সহিহ বুখারি : ১৪৬১

[২৮১] সূরা দাহর : ৮

দানশীলতার গুণটি আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হলো—আল কারিম। কুরআনকে 'কারিম' নামেও ডাকা হয়। জিবরাইল (আ.)-কে 'কারিম' নামে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। নবিজিকেও 'কারিম' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। 'কারিম' দুই ধরনের হতে পারে—

- দান-সাদাকা করা এবং
- পরিবারের সাথে, আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করা।

অন্যের সাথে হাসিমুখে কথা বললে, প্রয়োজনে এগিয়ে গেলে, আন্তরিকতা দেখানোটা দান-সাদাকার সমপর্যায়ের। আপনি যদি আর্থিকভাবে দান-সাদাকা করতে না পারেন, এই কাজগুলোর মাধ্যমেও দান-সাদাকার সমপরিমাণ সওয়াব অর্জন করতে পারেন। আর তা যদি পরিবারের পেছনেও ব্যয় করেন, সাদাকার সওয়াব পাবেন।

নবিজি বলেন—আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক দিনার ব্যয় করা, একজন দাস মুক্ত করতে এক দিনার ব্যয় করা, গরিব লোককে এক দিনার দান এবং পরিবারের পেছনে এক দিনার ব্যয় করা; এসবের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো—পরিবারের পেছনে এক দিনার ব্যয় করা।[২৮৩]

দানশীলতার গুণটি পরিবার থেকে শুরু করতে হবে, তারপর সমাজ। আমরা পরিবারের লোকদের জন্য যেমন ব্যয় করব, তেমনই ব্যয় করব বাইরের লোকজনের মধ্যে।

নবিজির জীবনে দানশীলতার গুণের পরিমাণ বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর পুরো জীবনটাই কেটে গেছে অন্যকে দান করার মধ্য দিয়ে। নিজের দিকটা চিন্তা না করে তিনি অন্যের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিতেন, দান করতেন। তাঁর এমন দানশীলতার বৈশিষ্ট্য একটি হাদিস থেকে সহজে বোঝা যায়। জাবির (রা.) বলেন—নবিজির নিকট কোনো জিনিস চাওয়া হলে, তিনি কখনোই 'না' বলেননি।[২৮৪]

অর্থাৎ, নবিজির কাছে কেউ কিছু চাইতে এলে তিনি নিঃসংকোচে সেটা দিয়ে দিতেন; ধমক দেওয়া তো অনেক দূরের কথা!

মনে করুন, আপনি খুব শখ করে একটি মোবাইল কিনলেন। অনেক দিনের জমানো টাকা দিয়েই তা কেনা হলো। টাকা বাঁচাতে গিয়ে অনেক সময় দুই

---

[২৮২] সূরা দাহর : ৯

[283] সহিহ মুসলিম : ২২০১

[২৮৪] সহিহ বুখারি : ৬০৩৪

কিলোমিটার রাস্তা গাড়িতে না চড়ে হেঁটেছেন। দুপুরের খাবারে ভালো খাবার খাননি, মন চেয়েছিল এক পিস মুরগির ঝাল ফ্রাই খাই; কিন্তু লোভাতুর জিহ্বা সংবরণ করেছেন। সেই শখের টাকা দিয়ে মোবাইলটি মার্কেট থেকে কেনার পর কিছুক্ষণ ব্যবহার করলেন। নতুন মোবাইল! আপনি খুব উন্মত্ত হয়ে আছেন।

হঠাৎ আপনার এক বন্ধু এসে বলল—দোস্ত, তোর মোবাইলটা তো অনেক সুন্দর। আমাকে দিয়ে দে না, প্লিজ! তখন ওই বন্ধুর আবদার শুনে আপনার কেমন লাগবে? সে যদি সত্যিই বারবার এমন বলতে থাকে, আমার ধারণা, আপনি তো রাগে গড়গড় করবেন। আবদার বাড়তে থাকলে একসময় হয়তো ধমক দেবেন। এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক, তাই না?

একবার এক মহিলা নবিজিকে একটি চাদর উপহার দিলেন। চাদরটি ঝালরসহ বোনা। এমনিতেই নবিজির একটি চাদরের খুব প্রয়োজন ছিল। তার মাঝেই মহিলাটিও শখ করে চাদরটি দিলেন। হাতে পাওয়ার পর নবিজি চাদরটি পরলেন। এমন সুন্দর চাদর পরে নবিজি নিশ্চয়ই খুব উচ্ছ্বসিত ছিলেন, সাহাবিরাও নিশ্চয় রাসূলুল্লাহকে এমন চাদর পরতে দেখে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন!

এমন সময় একজন সাহাবি এসে নবিজিকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চাদরটি তো বেশ সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন।

নবিজি পুরো জীবনে যে কয়বার সুন্দর আর দামি জামা পরেছিলেন, এটি ছিল তার মধ্যে একটি। ঠিক এমন মুহূর্তে এই আবদার শুনে তিনি কী বলবেন, তাঁর কি রাগ করা উচিত? ওই সাহাবিকে ধমক দেওয়া উচিত? না, এর কোনোটিই করেননি। নবিজি বললেন, হ্যাঁ। তুমি চাদরটি নিয়ে নিয়া। এই বলে তিনি উঠে চলে গেলেন (সাহাবি চাদরটি পেয়ে যান)।[২৮৫]

বাকি সাহাবিরা তখন ওই সাহাবিকে বললেন, তুমি কাজটি ঠিক করোনি। তুমি তো দেখলেই—চাদরটি তাঁর প্রয়োজন, এরপরও সেটা চাইলে? অথচ তুমি জানো, নবিজির কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনোই 'না' করেন না। ওই সাহাবি জবাব দিলেন—নবিজি যখন এটা পরেছেন, তাঁর বরকত লাভের জন্যই আমি এটা চাই। যেন এই চাদরে আমাকে দাফন করা হয়।[২৮৬]

নবিজি এত এত দান করতেন—সাহাবিরাও পর্যন্ত জানতেন, তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি কাউকেই কখনো ফিরিয়ে দেন না।

---

[২৮৫] সহিহ বুখারি : ৬০৩৬

[২৮৬] সহিহ বুখারি : ৬০৩৬

নবিজির ওফাতের পূর্বে তাঁর ঘরে ছিল মাত্র ৭ দিরহাম। আমাদের সময়ে এক দিরহামের মূল্য হবে ৪০০ টাকার মতো। অর্থাৎ নবিজির চলে যাওয়ার পূর্বে ঘরে ছিল মাত্র ২৮০০ টাকার কাছাকাছি। তিনি তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.)-কে বলেন সেগুলো দান করে দিতে। আল্লাহর কাছে তিনি ফিরে যেতে চান একেবারে খালি হাতে। এই সামান্য মুদ্রাগুলোও রাখতে চান না।

আয়িশা (রা.) যখন বায়তুলমাল থেকে ভাতা পেতেন, সাথে সাথে দান করে দিতেন। নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। সাহাবিদের জীবনী পড়লে এমন দানশীলতার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। নবিজি অন্যকে দান করা, সম্মান দেখানোকে ঈমানের সাথে যুক্ত করেছেন। তিনি বলেন—

- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।
- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে যথাযথ খাতির করে।[২৮৭]

আপনি ভালো ঈমানদার হতে চাইলে প্রতিবেশীকে সম্মান করতে হবে, মেহমানকে আদর-আপ্যায়ন করতে হবে, গরিবকে দান-সাদাকা করতে হবে। অন্যকে দান করা বলতে কেবল টাকা দান করাকেই বোঝায় না। আপনি আপনার 'সময়' দান করতে পারেন, 'মেধা' দান করতে পারেন। কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে যান। যেখানে মেধা দিয়ে কারও সমস্যা দূর করা প্রয়োজন, তা দিয়েই তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন। এর ফলেও সাদাকার সওয়াব পাবেন।

আপনি যখন মানুষের প্রতি উদার আচরণ করবেন, দান করবেন—আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন, মানুষজন আপনাকে ভালোবাসবে। যখন কোনো ভুল করবেন, মানুষজন সুন্দর করে সংশোধন করে দেবে বা সেগুলো এড়িয়ে যাবে। নবিজি বলেন—আল্লাহ দানশীল, তিনি দানশীলতাকে ভালোবাসেন।[২৮৮]

---

[২৮৭] সহিহ বুখারি : ৬০১৯

[২৮৮] জামে আত-তিরমিজি : ২৭৯৯

অন্যের সাথে পরামর্শ করা

মুমিন চিন্তাভাবনা ছাড়া, অন্যের সাথে পরামর্শ না করে বড়ো ধরনের কোনো কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতে বলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।'[২৮৯]

এই আয়াতে আল্লাহ যেমন নবিজিকে নির্দেশ দেন, তেমনই মুমিনদেরও জানিয়ে দেন কাজে-কর্মে পরামর্শ করতে। মুমিনের গুণাবলির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

'যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামাজ কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে...'[২৯০]

একজন মুমিন একা একা সিদ্ধান্ত নেয় না। সে চারপাশের পরিবেশ অবজ্ঞা-উপেক্ষা করে যেমন মনে চায় তেমন কাজ করে না। কোনো কাজ করতে গেলে সে তার পরিবার, বন্ধু বা আত্মীয়ের সাথে পরামর্শ করে তারপর ওই কাজের দিকে পা বাড়ায়।

নবিজির পুরো জীবনী পড়লে দেখা যায়, তিনি প্রতিটি বড়ো বড়ো ক্ষেত্রে সাহাবিদের পরামর্শ চেয়েছেন। সাহাবিরা কোনো পরামর্শ দিলে তিনি গুরুত্বের সাথে পরামর্শটি গ্রহণ করেন। যেমন :

- বদর যুদ্ধ শুরুর পূর্বে নবিজি আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের পরামর্শ চান।
- বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দিদের কী করা হবে, সে ব্যাপারে সাহাবিদের পরামর্শ চান। তখন আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা পরামর্শ দেন।
- উহুদ যুদ্ধে সাহাবিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।
- খন্দক যুদ্ধে যুদ্ধের রণকৌশল সম্পর্কে সালমান ফারসি (রা.) পরামর্শ দেন।

---

[২৮৯] সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

[২৯০] সূরা শুরা : ৩৮

• হাফসা (রা.) বিধবা হওয়ার পর নবিজি তাঁকে বিয়ে করার ব্যাপারে আবু বক্কর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে পরামর্শ করেন।

• ইফকের ঘটনার সময় আলি (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করেন।

• স্ত্রীদের তালাকের ব্যাপারে জায়েদ ইবনে হারিসা ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে পরামর্শ করেন।

• তালাকের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাজিল হলে তিনি আয়িশা (রা.)-কে বলেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি যেন পরিবারের সাথে পরামর্শ করেন।

তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল; ওহি দ্বারা পরিচালিত। তারপরও তিনি কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে মানুষের সাথে পরামর্শ করেন। তা ছাড়া আমরা তো মানুষ, যেকোনো কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের স্বভাবজাত। সেই হিসেবে নবি ও সাহাবিদের তুলনায় আমাদের আরও বেশি পরামর্শ করা দরকার। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি নবিজির চেয়ে কাউকে এত বেশি পরামর্শ করতে দেখিনি।[২৯১]

হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল সাহাবিদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। সবাই আশা করে এসেছিলেন কাবা তাওয়াফ করবেন। কিন্তু সন্ধি হওয়ার দরুন সেবারের যাত্রা স্থগিত করা হয়, তাঁরা পরেরবার যাবেন। সাহাবিরা এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। সবচেয়ে কঠোর আপত্তি জানান উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)।

নবিজি সাহাবিদের কুরবানি করার ও মাথা মুণ্ডনের নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ তিনি তিনবার দেন, কিন্তু সাহাবিরা কেউ উঠলেন না। তাঁরা খুব হতাশ ছিলেন। সেই সফরে উম্মে সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহর সফরসঙ্গী ছিলেন। নবিজি সাহাবিদের এমন আচরণের কথা তাঁকে জানালেন। উম্মে সালামা (রা.) নবিজিকে পরামর্শ দেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি তা-ই চান, তাহলে বাইরে গিয়ে তাঁদের সাথে কোনো কথা না বলে আপনার নিজের উট কুরবানি এবং ক্ষুরাকার ডেকে মাথা মুণ্ডন করুন।

নবিজি স্ত্রীর কথামতো তা-ই করলেন। তাঁকে দেখে সাহাবিরা এবার উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁরাও তাঁর অনুসরণ করলেন।[২৯২]

উম্মে সালামা (রা.) নবিজিকে যে ধরনের নেতৃত্বের পরামর্শ দেন, সেটা হলো—'Leading by example' বা উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্বদান। যিনি কিনা

---

[২৯১] মুসনাদে আহমাদ : ১৭৯২৮

[২৯২] সহিহ বুখারি : ২৭৩১

নবি ও রাসূল, যার ওপর সরাসরি আল্লাহর ওহি নাজিল হয়, তিনি পর্যন্ত স্ত্রীর পরামর্শ নেন এবং তা আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেন। এই ব্যাপারে স্ত্রীর কাছে পরামর্শ নিতে কোনো ধরনের সংকোচবোধ করেননি।

উম্মে সালামা (রা.)-এর নবিজিকে এত বড়ো পরামর্শ দিতে সামান্য ইতস্তবোধ করেননি। এটাও মনে করেননি—আমি আর কী বলব, আপনি যা ভালো মনে করেন, তা-ই করুন কিংবা আল্লাহ হয়তো আপনার ওপর ওহি নাজিল মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। না, তিনি বরং নিজ থেকে পরামর্শ দেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল এই পরামর্শ কাজে দিতে পারে। ফলে নিঃসংকোচে তিনি নবিজিকে উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্বদানের পরামর্শ দেন।

নবিজি নিজের স্ত্রীদের সাথে এমনভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, তিনি নবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রীরা তাঁর সাথে মন খুলে কথা বলতে পারতেন। যেকোনো বিষয় উন্মুক্তভাবে আলোচনা করতে পারতেন।

খুলাফায়ে রাশেদার জীবনীতেও দেখা যায়, তারা সব সময় মানুষের উপদেশ গ্রহণ করতেন। আবু বকর (রা.) তাঁর প্রথম ভাষণে মানুষের পরামর্শ চান; পরবর্তী সময়ে খিলাফত পরিচালনা করতে গিয়ে সাহাবিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর পুরো খিলাফতকালই ছিল সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে। বড়ো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সবার সাথে কথা বলে তারপর সিদ্ধান্ত নিতেন। উসমান ইবনে আফফান (রা.) কুরআনের মুসহাফ সংকলন করতে গিয়ে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন এবং সে অনুযায়ীই কাজ করেন।

যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে পরামর্শ শেষে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর যদি এর ফলাফল খারাপ আসে, তাহলে যেন পরামর্শদাতাদের দোষারোপ করা না হয়। কেননা, পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়, আর ভরসা করতে হয় আল্লাহর ওপর। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করবে।'[২৯৩]

কেউ যদি আমাদের কাছে কোনো পরামর্শ চাইতে আসে, আমরা যেন পরামর্শ দিই। তবে জেনেবুঝে তাকে কোনো ভুল পরামর্শ দেওয়া যাবে না। নবিজি বলেন—তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট পরামর্শ চাইলে, সে যেন তাকে সঠিক পরামর্শই দেয়।'[২৯৪]

---

[২৯৩] সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

[২৯৪] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৭৪৭

কেউ যখন কোনো ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে আসে, তখন সেটা আমানত হয়ে যায়। কেউ একজন এসে একটি ব্যাবসার ব্যাপারে পরামর্শ চাইল, আপনি পরামর্শ দিলেন। তারপর ওই ব্যাবসারই আরেক ব্যবসায়ী প্রতিযোগী এসে আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে তাকেও একই পরামর্শের ব্যাপারে বলে ফেললেন। ফলে যে প্রথমে পরামর্শ চাইতে এলো, সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এমনটা করা যাবে না। নবিজি বলেন—যে ব্যক্তির নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, সে একজন আমানতদার।[২৯৫]

আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ। আপনি একজনের পরামর্শ, প্ল্যানের কথা আরেকজনকে জানিয়ে দিচ্ছেন। এটা হলো আমানতের খেয়ানত। এগুলোকে ছোটোখাটো মনে করার কোনো কারণ নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, কোনো একটি পরামর্শ পাওয়ার পর সেটা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক কি না?

উত্তর হলো, না। পরামর্শ চাইতে পারেন, কিন্তু ওই অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত নিতে হবে; এ রকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পরামর্শটি যদি যৌক্তিক মনে হয় গ্রহণ করবেন, না হলে করবেন না। এটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

সব মানুষ সর্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ না। একই বিষয়ে সবাই উত্তম পরামর্শ দিতে পারবে না। হতে পারে কারও পরামর্শের একটি অংশ আপনার পছন্দ হয়েছে, সেই অংশের আলোকে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। একজন আলিম বলেন, আপনি যখন কারও কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন, তখন তার বুদ্ধিমত্তা ধার নিচ্ছেন।

তার সারাজীবনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতার আলোকে সে আপনাকে পরামর্শ দেবে। আপনি সেই পরামর্শ চাইতেই পেয়ে গেলেন। পরামর্শের আরবি হলো 'শুরা'। শুরার সাথে আরেকটি কাজ করতে হবে, তা হলো—ইস্তিখারা। ইস্তিখারা ব্যক্তিগত আমল, শুরা সামষ্টিক আমল। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই দুটি বিবেচনা করতে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাধান্যও দিতে হবে।

যেকোনো বিষয়ে পরামর্শ কেবল তাদের সাথে করতে হবে, যাদের আপনি ভালোবাসেন, বিশ্বাস করেন। আপনি একজনকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তার ওপর ভরসা করতে পারেন না; এমন লোকের কাছ থেকে পরামর্শ করতে যাবেন না। হতে পারে সে আপনার ক্ষতি করতে বা তার উত্তম পরামর্শ আপনার মনঃপূত হবে না।

ইস্তিখারা ও শুরার পর আপনি যে সিদ্ধান্ত নেন, সেটা সঠিক সিদ্ধান্ত। এরপর দ্বিধা করলে হবে না। আপনাকে আপনার সিদ্ধান্তে অটুট থাকতে হবে। যদি ফলাফল খারাপ আসে, হয়তো এই খারাপ ফলের মধ্যেই কোনো কল্যাণ নিহিত আছে,

---

[২৯৫] জামে আত-তিরমিজি : ২৮২২

যা তাৎক্ষণিকভাবে আপনি বুঝতে পারছেন না। ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, এটাই যথেষ্ট। এরপর যে ফলাফল আসে, তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়াই উত্তম।

যখন কারও সাথে পরামর্শ করতে যাবেন, এর মাধ্যমে তার প্রতি আপনার ভালোবাসা ও আস্থার জানান দিলেন। ফলে তার সাথে আপনার সম্পর্ক মজবুত হবে। অন্যদিকে কেউ যদি আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে আসে, তার ব্যাপারেও আপনি উত্তম ধারণা রাখবেন, সম্পর্ক আরও গভীর হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট, পরামর্শ গ্রহণের আমলটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন জরুরি, তেমনই পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্যও জরুরি এবং বেশ বরকতময় ও ফলদায়ক।

অন্যকে ভালোবাসা

এক যুবক ইসলাম শেখার জন্য দামেশক যান। তিনি ভিন্ন ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার নাম ছিল আবু ইদরিস আল খাওলানি। পরবর্তী সময়ে তিনি উমাইয়া খিলাফতের প্রধান বিচারপতি হন।

যুবক অবস্থায় তিনি দামেশকের গ্র্যান্ড মসজিদে গিয়ে দেখতে পান, একটি হালাকায় অনেকেই বসে আছেন। আর একজন শাইখ সেখানে দারস দিচ্ছেন বা পড়াচ্ছেন। সেই শাইখ ছিলেন খুব কম বয়সি। তাঁকে দেখামাত্রই তিনি পছন্দ করেন। তিনি অন্যদের জিজ্ঞেস করলেন, উনি কে?

তাকে বলা হলো, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)। আবু ইদরিস আল খাওলালি (রহ.) মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর সাথে দেখা করার জন্য পরদিন আগে আগে মসজিদে যান। উপস্থিত হয়ে দেখতে পান তিনি নামাজ পড়ছেন।

নামাজ শেষে তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে ভালোবাসি। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কসম? অর্থাৎ, এতটা নিশ্চিত হয়ে বলছ যে, তুমি আমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসো?

—জি, আল্লাহর কসম।

—আল্লাহর কসম?

—জি, আল্লাহর কসম।

অতঃপর মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) তাঁর চাদরের আঁচল ধরে টেনে বললেন, তাহলে তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো।

এই বলে মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) আবু ইদরিস আল খাওলানিকে নবিজির একটি হাদিস শোনান। নবিজি বলেন—তাদের ভালোবাসা আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়, যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, যারা আমার

জন্য একসাথে বসে, যারা আমার জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ করে, যারা আমার জন্যই একে অন্যের জন্য ব্যয় করে।[২৯৬]

এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য কী? কেন একজন মুমিন আরেকজনের সাথে ভালো আচরণ করবে, এমনটাই তো? হ্যাঁ, এমনটা হলেও এর মূল কারণ হতে হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। একজন মুমিন আরেকজনকে ভালোবাসলে তবেই তার সাথে উত্তম আচরণ করতে পারবে। আরেকজনের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে কীভাবে তার প্রতি দানশীল আচরণ করতে পারে? তাকে উত্তম পরামর্শ দিতে পারে? দোষ গোপন রাখতে পারে? ক্ষমা করে দিতে পারে?

বোঝা গেল, উত্তম আখলাকের মূল হলো ভালোবাসা। একে অন্যের প্রতি ভালোবাসাবোধের কারণেই মানুষ অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করে। নবিজি বলেন, ঈমানদার ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে।[২৯৭]

অপর একজন মুমিন ভাইকে ভালোবাসা নফল কোনো ইবাদত নয়, এটা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি অন্য মুমিনকে যদি না ভালোবাসেন, কখনোই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবেন না। প্রকৃত ঈমানদার না হলে জান্নাতে প্রবেশ করা অসম্ভব। জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলে আপনাকে অবশ্যই অপর মুমিন ভাইয়ের জন্য থাকতে ভালোবাসতে হবে। আর এটা তখন 'আখলাক' থাকে না, হয়ে যায় 'আকিদা'।

নবিজি একজন সাহাবির কথা বললেন, যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। অন্য একজন সাহাবি জানতে চাইলেন তাঁর আমল কী? তাঁর আমল সম্পর্কে জানতে তিনি গিয়ে ওই সাহাবির বাড়িতে দেখা করলেন। দেখতে পেলেন তিনি অতিরিক্ত নামাজ পড়েন না, ইবাদত করেন না, তাহলে কীসের জন্য তিনি জান্নাত লাভ করবেন?

অতঃপর জানালেন, অন্য মুসলিমের প্রতি তিনি বিদ্বেষ পোষণ করেন না। এই কারণে তিনি জান্নাত লাভ করবেন।[২৯৮]

পূর্ববর্তী যুগের এক লোক একবার তাঁর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আরেক গ্রামে যায়। আল্লাহ মানুষ রূপে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

---

[২৯৬] মুসনাদে আহমাদ : ২১৫২৫

[২৯৭] সহিহ মুসলিম : ৯৮

[298] মুসনাদে আহমাদ : ১২২৮৬

—আমি অমুক গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।

—তার কাছে কি তোমার কোনো আবদার আছে? কোনো কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে তার কাছে যাচ্ছ?

—না, আমি তো কেবল আল্লাহর জন্য তাকে ভালোবাসি।

—ফেরেশতা তাকে জানালেন, আমি আল্লাহর ফেরেশতা, তোমাকে অবহিত করার জন্য এসেছি—আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবেসেছ।[২৯৯]

লোকটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার ভাইকে পছন্দ করত। ফলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে তাঁর প্রিয় বান্দার অন্তর্ভুক্ত করেন। মানুষকে যদি কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা যায়, আল্লাহর কাছে এরচেয়েও বেশি মর্যাদা রয়েছে। নবিজি বলেন, আল্লাহ বলেন—আমার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য রয়েছে নুরের মিম্বর। নবি ও শহিদগণ পর্যন্ত তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হবে।[৩০০]

আপনার ঈমানের পূর্ণতা তখনই পাবে, আপনি যদি কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন। ঈমানের মিষ্টতা-প্রশান্তি তখনই অনুভব করতে পারবেন, আপনি যদি কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন।

কাউকে অন্তর থেকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসলে, জান্নাতে তার সাথে থাকার সুসংবাদ দিয়েছেন। আপনার জান্নাতে থাকার মর্যাদা হয়তো নিচু স্তরে হতে পারে, কিন্তু কাউকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসার ফলে তার প্রতি দয়া-মমতার জন্য আল্লাহ আপনাকে তার সাথে রাখবেন।

একবার জনৈক বেদুইন এসে নবিজিকে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন হবে?

তিনি পালটা প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, কিয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করেছ? সে বলল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। এ কথা শুনে নবিজি বললেন—যাকে তুমি ভালোবাসো, তাঁর সাথেই তোমার কিয়ামত হবে (অর্থাৎ তোমার সঙ্গী)।

এই হাদিসটি আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তখন কমবয়সি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে হাদিসটি বর্ণনার সময় বলেন—আমার কাছে এই হাদিসের চেয়ে প্রিয় আর কোনো হাদিস নেই। আমি নবিজিকে, আবু বকর,

---

[২৯৯] সহিহ মুসলিম : ৬৪৪৩

[৩০০] জামে আত-তিরমিজি : ২৩৯০

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে ভালোবাসি। আশা করি, তাঁদের ভালোবাসি বলেই তাঁদের সাথে জান্নাতে বসবাস করতে পারব; যদিও তাঁদের আমলের মতো আমি আমল করতে পারিনি।[৩০১]

আপনি যদি আবু বকর (রা.)-কে ভালোবাসেন, তাহলে তাঁর মতো ইবাদত না করেও জান্নাতে তাঁর সঙ্গী হতে পারেন। এটা হলো অন্যকে ভালোবাসার সবচেয়ে বড়ো ফজিলত। একজন আলিমকে যদি ভালোবাসেন, তাঁর মতো আমল না করেও জান্নাতে তার সঙ্গী হতে পারেন; কেবল তার প্রতি ভালোবাসার কারণে।

আমরা বেশির ভাগ সময়ই শুধু ইবাদত (নামাজ, রোজা, জিকির) নিয়ে কথা বলি। কিন্তু আখলাক এবং মুমিনের ব্যক্তিত্ব কেমন হওয়া উচিত বা এর জন্য কী কী আমল করা প্রয়োজন এ নিয়ে কথা বলি না। ইসলাম যেমন ইবাদতের নাম, তেমনই আখলাকেরও নাম। আমল ও আখলাক এ দুয়ের সমন্বয়েই ইসলাম। আল্লাহ আমাদের উত্তম আমল করার তওফিক দিন, আমিন।

তবে নবিজির একটি হাদিস দিয়ে পুরো বইয়ের ইতি টানতে চাই। নবিজি বলেন—তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।[৩০২]

---

[৩০১] সহিহ বুখারি : ৩৬৮৮

[৩০২] সহিহ বুখারি : ১৩

অনুবাদক পরিচিতি

আরিফুল ইসলাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী। একাধিক মৌলিক বইয়ের লেখক হলেও এই বইটি লেখকের তৃতীয় অনুবাদগ্রন্থ।

আখলাক মুমিনের ভূষণ। এই ভূষণের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে ইসলামের ছাঁয়াতলে এসেছে শত-সহস্র বনি আদম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ উপমা। তাঁদের পরশধন্য মুমিনদের আখলাক ছিল ঈর্ষণীয়। দুনিয়ার তাবৎ সাম্রাজ্য-সভ্যতা শির নত করেছিল তাঁদের চারিত্রিক শক্তির নিকট।

কিন্তু সেই মুমিনদের আখলাকের এখন এ কী দশা! আধুনিক যুগে যুবকদের অন্যতম প্রধান সমস্যার নাম চারিত্রিক পদস্খলন। বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এই সমস্যার ভয়াবহতা আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি।

তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে দ্রুতই আমাদের নববি আখলাকের দিকে ধাবিত হতে হবে। ধারণ করতে হবে সাহাবায়ে আজমাইনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এই বইটিতে কুরআন, হাদিস ও সিরাতের আলোকে মুমিনের আখলাকের চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সমসাময়িক উদাহরণ তুলে ধরায় বইটি হয়েছে অধিকতর জীবন্ত।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস
02-57163214, 01710 197558
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com
978-984-95582-9-3